বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 597. May, 1913.

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। "

৫০ বর্ষ। ৫৯৭ সংখ্যা। } বৈশাখ, ১৩২০। মে, ১৯১৩ { ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
শেঃ	৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
	বু	শ	বৃ	শ	ম	শু
	†A	M	J	Jy.	Au.	S
	‡14	15	15	17	17	17
আঃ	ম	বৃ	র	বু	শু	সো
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	বু	শু	সো	বু	র	ম

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২০ সাল।
ফসলী ১৩২০—২১।
হিজরী ১৩৩০—৩১।
খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৩—১৪।
শকাব্দ ১৮৩৫।
সংবৎ ১৯৭০—৭১।
মগী ১১৭৫—৭৬।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৮৪—৮৫।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	শ	সো	ম	বু	শু	র
শেঃ	৩০	২৯	২৯	৩০	৩০	৩০
	র	সো	ম	বৃ	শ	সো
	O	N	D	J	F	M
	18	17	16	14	13	15
আঃ	বৃ	শ	সো	বৃ	র	র
শেঃ	31	30	31	31	28	31
	শু	র	বৃ	শ	শ	ম

সো	বৃ	র	বৃ	র	বু
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ
বু	শ	ম	শ	ম	শু
বৃ	র	বু	র	বৃ	শ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
শ	ম	শু	ম	শু	সো
র	বু	শ	বু	শ	ম

§	১	৮	১৫	২২	২৯
	২	৯	১৬	২৩	৩০
	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	৪	১১	১৮	২৫	৩২
	৫	১২	১৯	২৬	
	৬	১৩	২০	২৭	
	৭	১৪	২১	২৮	

শ	সো	ম	বু	শু	র
র	ম	বু	বৃ	শ	সো
সো	বু	বৃ	শু	র	ম
ম	বৃ	শু	শ	সো	বু
বু	শু	শ	র	ম	বৃ
বৃ	শ	র	সো	বু	শু
শু	র	সো	ম	বৃ	শ

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	৪	২	৩০	২৭	২৬	২৪
পূঃ	৭	৬	৪	২	৩১	২৯
কৃঃ এঃ,	১৯	১৭	১৬	১৩	১২	১০
অঃ,	২৩	২১	২০	১৭	১৫	১৪

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।
শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ পূর্ণিমা
কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা

*** ৪ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, শুক্ল একাদশী। ৭ই বৈশাখ রবিবার ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পূর্ণিমা।

১৯শে বৈশাখ শুক্রবার ও ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার কৃষ্ণ একাদশী।

২৩শে বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ সোমবার আরম্ভ ও ৩১শে বুধবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল, আরম্ভ মঙ্গলবার শেষ ৩০শে বুধবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ সোমবার, ২রা মঙ্গলবার, ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ২রা শুক্রবার ইত্যাদি।

বৈশাখ সোমবার } ১, ৮, ১৫,
জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি } ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	২৩	২৩	২৪	২৪	২৪	২৩
পূঃ,	২৭	২৭	২৮	২৮	২৮	২৭
কৃঃ এঃ,	৯	৮	৮	৯	৮	৮
অঃ	১২	১২	১২	১৩	১২	১২

*** ২৩শে কার্ত্তিক রবিবার শুক্ল একাদশী। ২৭শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা।

৯ই কার্ত্তিক রবিবার, কৃষ্ণ-একাদশী। ১২ই কার্ত্তিক বুধবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নব বর্ষ।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

কৃপাময় বিধাতার অশেষ করুণায়, এক বৎসর নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা পুনরায় নব বর্ষের নব সুপ্রভাতের আবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এস, নব বর্ষ, নূতন আলোক, নূতন উৎসাহ, নূতন আশা লইয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ কর। আমরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে আজ তোমাকে বরণ করি। তুমি নূতন অনুরাগে ও নব জীবনে আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর।

আজ সকল মৃতভাব, সকল নৈরাশ্য, সকল দুর্ব্বলতা দূরে পলায়ন করুক। বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি-রাজ্যে, বৃক্ষলতা যেমন পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া নব বেশে নব জীবনের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, আজি আমরাও সেইরূপ নবোৎসাহে, নব আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হইয়া নব বর্ষে নব জীবনের পরিচয় প্রদান করিব এই আশা লইয়া একাগ্রমনে কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আজি যাহাকে নূতন বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি, বৎসরান্তে তাহাকেই আবার পুরাতন বলিয়া বিদায় দিতে হইবে। কালের গতি এইরূপ, সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। জল-স্রোতের ন্যায় কালস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। এই কালস্রোতের মধ্যে যে যেটুকু কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হইবে, কালের ইতিহাসে তাহারই স্মৃতি চিরজাগ্রত থাকিবে। তবে আজি এই নব বর্ষের শুভ সমাগমে আমরা আর অচেতন হইয়া থাকিব না। চৈতন্য লাভ করিয়া চৈতন্যময়কে পাইবার জন্য ব্যগ্র হই। ইহাঁতেই জীবনের মুক্তি, ইহাঁতেই সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। জগতে কত পরিবর্ত্তন, কত ভাঙ্গা গড়া, কত নূতনের আবাহান, পুরাতনের বিদায় চলিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর চির নূতন, চির-সত্য, সকল স্থানে ও সকল কালে বর্ত্তমান, তাঁহার মহিমা ও জ্ঞান নিত্য নবভাবে প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহার আদি নাই, তাঁহার অন্ত নাই।

হে জীব সকল, তবে এস আমরা উত্থান করি, অজ্ঞান ও মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হই এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া নব বর্ষে নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া ধন্য হই।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

(১) যে গ্রন্থ মানবজীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা না দেয়, তাহা তৃণবৎ ত্যাজ্য।

(২) Virtue alone is productive of goodly fruits, which yield abundance, not only for

the time being but for the future, bringing blessings upon posterity. But sin is barren.

কেবল ধর্ম্মই অত্যুৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করে। তাহার দ্বারা যে কেবল সেই সময়ের লোক উপকৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ের লোকেরও প্রভূত উপকার সাধিত হয়। ইহা ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের উপরও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে। কিন্তু পাপের দ্বারা কোন ফললাভ হয় না।

(৩) O, men of grace! He who sees his master's face will not in his prayer recall that he is chastised at all.

হে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিগণ, যে প্রভুর মুখ দেখিতে পায়, সে কিছুমাত্রও শাসিত হইতেছে এমন কথা প্রার্থনার সময় স্মরণ করিবে না।

(রাবেয়া)

(৪) Cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee.

প্রভুর উপর সকল ভার অর্পণ কর, তিনি তোমার ভরণ পোষণ করিবেন।

(৫) He satisfieth the longing soul.

তিনি আকাঙ্ক্ষিতের আশা পূর্ণ করেন।

(৬) সংত্যজ্য হৃদ্গুহেশং দেবমন্যং প্রার্থয়ন্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তকৌস্তুভাঃ॥

যাহারা হৃদয় গৃহের অধীশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আশ্রয় লয়, তাহারা হস্তস্থিত কৌস্তুভ মণি পরিত্যাগ করিয়া অন্য রত্ন লাভের ইচ্ছা করে।

(৭) Trust and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him.

বিশ্বাস করিয়া দেখ ঈশ্বর মঙ্গলময়। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে তাঁহাতে নির্ভর করে।

(৮) Examine all things, and hold fast to that which is good.

সব পরীক্ষা কর, যাহা ভাল তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

(সেণ্ট পল)

Duty is devotion. Duty is salvation. Duty is our final rest in heaven.

কর্ত্তব্যসাধনই ভগবানের আরাধনা, কর্ত্তব্যসাধনই মুক্তির উপায়, এবং কর্ত্তব্যসাধনই পরলোকের একমাত্র বিশ্রামস্থল।

নবজাত ভ্রাতুষ্পুত্র। *

আমরা যে পিতৃহীনা
　আমরা যে বড় "একা"
পূরাইতে সে অভাব
　তুমি কি গো দিলে দেখা?

* স্নেহের ভ্রাতা শ্রীমান্ সুকুমারের নবকুমার।

২

অই নীলপদ্মনেত্র
যখন দেখিনু চেয়ে,
কি আশা ভরসা যেন
জাগিল পরাণ পেয়ে!

৩

না জানি কাহার পুণ্যে
দয়াল বিধির বরে,
তরুণ অরুণ আলো
উজলে আঁধার ঘরে!

৪

কে বুঝি করিলা তপ
স্বরগ মাণিক আশে,
তাই এলে যাদুমণি
সহসা এ গৃহবাসে?

৫

এ ধন রাখিব কোথা
আমরা তা নাহি জানি,
সাধ হয় প্রাণে রাখি
চিরিয়া হৃদয়খানি।

৬

চাঁদের জ্যোছনা দিয়ে
গঠিত ও দেহটুক,
দ্বিতীয়ার শিশু শশী
আমরি ও সোণামুখ!

৭

অধম দরিদ্রে এ যে
বিধির অমূল্য দান,
হেরিলে ফিরে না আঁখি,
পরশে অবশ প্রাণ!

৮

এস এস প্রাণাধিক,
এস আঁধারের আলো,
মা বাপের কোল যুড়ি
নিত্য নব সুধা ঢালো।

৯

চির-জীবী চির-সুখী
হও বাছা দেববরে,
কুলের গৌরবরূপে
জাগ চির দিন তরে।

১০

স্বর্গ থেকে পিতামহ
সদা দিন শুভাশিষ,
তাঁর বংশে জন্ম তব
মনে রেখ অহর্নিশ।

১১

চাঁদমুখে চুমো দিয়ে
চাঁদটুকু বুকে তুলে,
আমরা যে পিতৃহীনা
আজি তা গিয়েছি ভুলে!

আশীর্ব্বাদিকা—পিসীমাগণ।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের অঙ্গাভরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা এই দুইটী ললাটভূষণের পর্য্যায়। (পত্র+পশ্+যণ্ঃ) পত্রাকারে বন্ধন করা হয় বলিয়া ইহার নাম পত্র-পাশ্যা। এই অলঙ্কার ললাটের পক্ষে অত্যধিক উপযুক্ত বলিয়া ইহার নাম ললাটিকা।

কর্ণিকা তালপত্রং স্যাৎ কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টনম্।

কর্ণিকা ও তালপত্র এই দুইটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত কর্ণালঙ্কারবিশেষের একার্থবাচক পর্য্যায় শব্দ। কর্ণের অলঙ্কার বলিয়া (কর্ণ+কন্) ইহাকে কর্ণিকা এবং তালপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া ইহাকে তালপত্র (তাড়পত্র) কহে। কর্ণ বেষ্টন অলঙ্কারের নাম কুণ্ডল, (কন্ড+কর্ত্তৃবাচ্যে কল্চ) কর্ণের শোভা দান করে বলিয়া ইহার নাম কুণ্ডল। অমর-কোষের টীকাকার মহেশ্বর পণ্ডিত বলেন, কর্ণিকা অলঙ্কার কেবল স্ত্রীলোকদিগের ধার্য্য এবং কুণ্ডলাভরণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই ধার্য্য। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় অলঙ্কারকে ঢেঁড়ি বা ধেঁড়ি কহে। বঙ্গদেশে এক্ষণে ঐ অলঙ্কারের প্রচলন প্রায় রহিত হইয়া আসিতেছে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার কর্ণ-ভূষণের নাম পাওয়া যায়। পুষ্পাকৃতি কর্ণভূষণবিশেষকে কর্ণফুল কহে। উহা বর্ত্তমান সময়ের চাঁপা ঝুম্‌কা প্রভৃতি অলঙ্কারের সদৃশ। কর্ণের পৃষ্ঠদেশে কর্ণেন্দু নামক আর এক প্রকার আভরণ পূর্ব্বে ধার্য্য ছিল। বোধ হয় উহা বর্ত্তমান সময়ের ব্যবহৃত কাণপাতার সদৃশ হইবে। বাহিরের দুই দিকে মুক্তাপংক্তি, মধ্যে নলক ঝুলান এবং অনেক হীরকবিশিষ্ট কর্ণভূষণ বিশেষ বজ্রগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বোধ হয় উহা এখনকার চৌদানির অনুরূপ হইতে পারে।

গ্রৈবেয়কং কণ্ঠভূষা লম্বনং স্যাল্ললন্তিকা।
স্বর্ণৈঃ প্রালম্বিকাথোরঃসূত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কৃতা॥

হারো মুক্তাবলী দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকা।
হারভেদা যষ্টিভেদা গুৎস গুৎসার্দ্ধগোস্তনা।
অর্দ্ধহারো মানবক একাবল্যেকযষ্টিকা।
সৈবনক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ॥

কণ্ঠের ভূষণবিশেষকে গ্রৈবেয়ক বলে। গ্রীবাকে ভূষিত করে বলিয়া ইহার নাম গ্রৈবেয়ক। বোধ হয় এই গহনাকেই বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে গুলিপাত কহে। লম্বমান কণ্ঠভূষণকে সাধারণতঃ লম্বন ও ললন্তিকা কহা যায়। ললন্তিকা স্থানে ললন্তিকা পাঠও কোন

কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। "আনাভিলম্বিকা ভূষা লম্বনঞ্চ ললন্তিকা" অর্থাৎ নাভি পর্যন্ত লম্বিত কণ্ঠভূষণই লম্বন ও ললন্তিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ লম্বমান কণ্ঠভূষণ সুবর্ণনির্ম্মিত হইলে তাহাকে প্রালম্বিকা এবং মুক্তা-নির্ম্মিত হইলে তাহাকে উরঃসূত্রিকা বলে। হার ও মুক্তাবলী শব্দে মুক্তার মালা বুঝায়। ঐ হার শতযষ্টিকা অর্থাৎ শতগুণ বা এক-শত-লহর হইলে তাহাকে দেবচ্ছন্দ কহে। দেবগণ আদরপূর্ব্বক উহা পরিধান করেন বলিয়া উহার নাম দেবচ্ছন্দ। যষ্টির গুণের অর্থাৎ লহরের বা লতার ভেদানুসারে গুৎস, গুৎসার্দ্ধ, গোস্তন, অর্দ্ধহার, মানবক, একাবলী প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। (গুধ + কর্তৃবাচ্যে স) গ্রীবা বেষ্টন করে বলিয়া গুৎস এই নাম হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকে গুৎস ইহার পরিবর্ত্তে গুচ্ছ এইরূপ পাঠ আছে। উক্ত গুৎস বা গুচ্ছ বত্রিশ লতাযুক্ত। চব্বিশ লতাযুক্ত হারকে গুৎসার্দ্ধ কহে। যে হার দেখিতে গোস্তন সদৃশ এবং চারি লহরযুক্ত তাহাকে গোস্তন কহে। অর্দ্ধহার কত লহরযুক্ত ছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন "অর্দ্ধহারস্ত চতুঃষষ্টিসারমতঃ" অর্থাৎ চৌষট্টি গুণ হারকে অর্দ্ধহার কহে। কিন্তু অমরকোষের অন্য টীকাকার মহেশ্বর পণ্ডিত বলেন "দ্বাদশযষ্টিকোর্দ্ধহার" অর্থাৎ বার লহরযুক্ত হার অর্দ্ধহার নামে খ্যাত। ঐ দুই মতের মধ্যে কোনটী প্রামাণিক তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। বিশ লহর যুক্ত হারের নাম মানবক। এক গুণ হারকে একাবলী কহে। সাতাইশটী মুক্তাহার দ্বারা গ্রথিত একাবলী হারকে নক্ষত্রমালা কহে।

উল্লিখিত প্রকারের লহরযুক্ত হার এক্ষণে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেমন দুর্গা প্রতিমাকে থাকে থাকে রাঙ্গের মালা দিয়া সাজান হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকালে সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থগণের মহিলাদিগকেও ভূষিত করিবার জন্য বহু থাকে বিভক্ত মণিমাণিক্যখচিত মালা দেওয়া হইত। এতদ্ভিন্ন পুষ্প-নির্ম্মিত অনেক প্রকার মালা বিলাসী পুরুষ ও বিলাসিনী নারীদিগের ব্যবহার্য্য ছিল। প্রাচীন হিন্দু সম্রাট্‌দিগের সময়ে এরূপ অনেক থাকে বিভক্ত বহুমূল্য মালা ছিল, উহা নাভি পর্য্যন্ত বা পাদ পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিত। উপরে যে কয়েকটী কণ্ঠ-ভূষণের উল্লেখ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার কণ্ঠভূষণ যে লহরের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ছিল না, এরূপ বলা যায় না। বোধ হয় সেগুলির পৃথক্ নাম ছিল না, নাম থাকিলেও আমরা সেই নাম সম্বন্ধে কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই।

আবাপকঃ পরিহার্য্যঃ কটকোবলয়স্ত্রিয়াম্।
কেয়ূরাঙ্গদং তুল্যো অঙ্গুলীয়কমূর্ম্মিকা।
সাক্ষরাঙ্গুলিমুদ্রা সা কঙ্কনং করভূষণম্॥

আবাবাক পরিহার্য্য কটক ও বলয়

এই কয়েকটীতে প্রকোষ্ঠের (কনুয়ের অধোভাগের) আভরণ বুঝায়। হস্তে বপন করা যায় বলিয়া উহাকে আবাপক বলে। উহা হস্তে পরিধানের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া সম্ভবতঃ উহাকে পরিহার্য্য বলে। হস্তকে সম্বরণ বা আচ্ছাদন করে বলিয়া উহাকে কটক বলা যায়।

কেয়ূর ও অঙ্গদ এই দুইটী বাহুভূষণ একার্থবাচক। কেয়ূরের লক্ষণ যথা—

সিংহবক্ত্রমুখাকারং নানারত্নবিনির্ম্মিতম্
সুসূক্ষ্মলম্বনং যুক্তং কেয়ূরং বাহুভূষণম্।

সিংহমুখাকৃতি নানারত্নবিনির্ম্মিত সুসূক্ষ্ম লম্বনযুক্ত বাহুভূষণকে কেয়ূর কহে। উহার হিন্দুস্থানী নাম বাহুবট বা বাজুবন্ধ। বাহুর উপরে থাকে বলিয়া উহার নাম কেয়ূর।

অঙ্গুলীয়ক ও উর্ম্মিকা শব্দে অঙ্গুলির ভূষণ বুঝায়, ইহাকে প্রচলিত ভাষায় অঙ্গুরী, আংটী ও আঙ্গুট বলে। অক্ষরযুক্ত অর্থাৎ নাম-খোদা-অঙ্গুরীকে অঙ্গুলিমুদ্রা কহে।

কঙ্কন এক প্রকার করভূষণ। কং অর্থাৎ সুখের নিমিত্ত শব্দ করে বলিয়া উহাকে কঙ্কন (কং+কন্+অচ্) কহে। ঐ অলঙ্কারের ঝন্ ঝন্ শব্দ শ্রবণকারীদিগের নিকটে ভাল লাগে বলিয়া শব্দবিৎ পণ্ডিতগণ উহার ঐ নাম রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কঙ্কন অলঙ্কারের প্রচলন ছিল, আমরাও প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের আমলের ঐ আভরণ দেখিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে ঐ অলঙ্কারের প্রচলন নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানের অনেক প্রদেশে কঙ্কণের বিশেষরূপ প্রচলন আছে।

স্ত্রীকোট্যাং মেখলা কাঞ্চী সপ্তকী রসনা তথা।
ক্লীবে সারসনং চাথ পুংস্কোট্যাং শৃঙ্খলং ত্রিষু॥

মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকী, রসনা ও সারসন এই পাঁচটী শব্দে স্ত্রীলোকদিগের কোটীভূষণবিশেষ বুঝায়। (মি+খল্) মাজায় উহা ক্ষেপণ করা যায় বা রাখা যায় বলিয়া উহাকে মেখলা কহে। "মেখলা অষ্টযষ্টিকা" আট লহরযুক্ত কাঞ্চীকে মেখলা কহে। বোধ হয় উহা বর্ত্তমান সময়ের কোমরপাট্টা বা চন্দ্রহার বিশেষের সদৃশ ছিল। (কচ্+ই) অত্যন্ত দীপ্তি পায় বলিয়া ইহাকে কাঞ্চি বলে। "একযষ্টি ভবেৎ কাঞ্চী" এক গুণ কোটীভূষণবিশেষকে কাঞ্চী (কাঞ্চি) বলে। ইহাকে অনেকে বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত গোট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "বিংশতিঃ সপ্তকী জ্ঞেয়া" বিশলহরযুক্ত কোটীভূষণকে সপ্তকী কহে। (রস্+কর্ত্তৃবাচ্যে ন) শব্দ করে বলিয়া রসনা কহে। "রসনা ষোড়শৈর্জ্ঞেয়া" ষোললহরযুক্ত কাঞ্চীকে আভিধানিকেরা রসনা বলেন। ইহার নামান্তর সারসন। আরসনের অর্থাৎ শব্দের সহিত বর্ত্তমান এই সমাসে সারসন হইয়াছে। পুরুষের কোটী-আভরণকে শৃঙ্খল বলে। উহা দেখিতে শৃঙ্খল বা শিকলের ন্যায়। উড়িষ্যা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি কোন কোন

পুরুষ উক্ত আভরণ ধারণ করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন আরও দুই একটি কোটীভূষণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। "কলাপঃ পঞ্চবিংশকাঃ" পঞ্চবিংশতি লহরযুক্ত কোটীভূষণকে কলাপ কহে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন কাব্যে কাঞ্চীদামের নাম দেখা যায়। উহা স্বর্ণাদিরচিত ও শব্দায়মান ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাদাঙ্গদং তুলাকোটিঃ মঞ্জীরোনূপুরোঽ-
স্ত্রিয়াম্।
হংসকঃ পাদকটকঃ কিঙ্কিণী ক্ষুদ্র-
ঘণ্টিকা॥

পাদাঙ্গদ, তুলাকোটী, মঞ্জীর, নূপুর, হংসক ও পাদকটক এই কয়েকটী পাদ-ভূষণ। তন্মধ্যে পাদাঙ্গদ ও পাদকটক এই দুইটী আভরণের শব্দ হয় না, অন্য গুলির শব্দ হয়। উক্ত চরণালঙ্কার-দ্বয়কেই হয়ত বাঙ্গালা ভাষায় খেড়ো (খাড়ুয়া) ও মল্ কহে। কেহ কেহ বলেন, হংসকেরও শব্দ হয় না। হস্তে যেমন অঙ্গদ নামক আভরণ ধারণ করা হইত, তেমনি পাদদেশে অনেকটা ঐ আকারের আভরণ পরিধান করা হইত বলিয়া উহার নাম পাদাঙ্গদ ছিল। (মঞ্জ্ + ঈর) চরণকে মুঞ্জ (মঞ্জ) অর্থাৎ মনোহর করে বলিয়া উহার নাম মঞ্জীর। ন্যূনতা পূরণ করে বলিয়া ইহার নাম নূপুর। নূপুরের ঐরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইবার কারণ ঠিক বলা যায় না। শরীরের সর্ব্ববিধ অলঙ্কার থাকিলেও যদি পায়ে নূপুর না থাকে তাহা হইলে ভাল হয় না, এই অভিপ্রায়ও উক্তবিধ ব্যুৎ-পত্তির কারণ হইতে পারে। যাঁহারা বলেন হংসকনামক পাদাভরণের শব্দ হয়, তাঁহারা হংসকশব্দের এইরূপ অর্থ করেন যে, হংসের ন্যায় শব্দ করে বলিয়া ইহার নাম (হংস + কৈ + ক) হংসক। যাঁহাদের মতে হংসকের শব্দ হয় না তাঁহারা বলেন রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া ঐ আভরণ দেখিতে রাজহংসের বা শ্বেত হংসের ন্যায় শুভ্র, এই জন্য উহার নাম হংসক। অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বর পণ্ডিত বলেন, উহার প্রচলিত নাম পৈজন। উহাই হয়ত স্থানবিশেষে পাইজোড় নামে প্রসিদ্ধ। কিঙ্কিণী ও ক্ষুদ্রঘণ্টিকাকে চলিত ভাষায় ঘাগর, ঘুংরা ও ঘুংঘুর প্রভৃতি কহে। উহা কুৎসিৎ অর্থাৎ অল্প ও অনতি-উচ্চ শব্দ করে বলিয়া উহার নাম (কিম্ + কণ্ + ইন্) কিঙ্কিণী। উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয় বলিয়া উহার নাম ক্ষুদ্রঘণ্টিকা।

কাব্য পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠে বোধ হয় সমস্ত পাদাভরণের মধ্যে নূপুরই অধিক আদরণীয় ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনানুসারে বঙ্গদেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে হস্তে কঙ্কণাভরণের ব্যবহার অপ্রচলনের ন্যায় পাদেও নূপুরাভরণের ব্যবহার অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের নিকটে

শুনিয়াছি, তাঁহাদের সময়েও নূপুরের বেশ প্রচলন ছিল। হিন্দুস্থানের অন্তর্গত অন্যান্য অনেক স্থলে পূর্ণভাবেই নূপুরের ব্যবহার আছে। যদি বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন যাত্রাদির দলে নূপুর না থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্বে নূপুরের আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিতাম না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কালিপুরাণে লিখিত নিয়মানুসারে পায়ে সোণার গহনা ধারণ করিতে নাই। অতি প্রাচীন কালে সকলেই এই নিয়ম পালিয়া চলিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেক প্রদেশেই লোকে পাদদেশে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করা দোষ বলিয়া বিবেচনা করেনা। হয়ত মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণে ভারতবর্ষের অন্তর্গত মাড়বার প্রভৃতি স্থানে পায়ে স্বর্ণালঙ্কার ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

এই প্রবন্ধে যে যে অঙ্গাভরণের নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সে গুলির অধিকাংশই স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গাভরণ। মুকুট, অঙ্গদ, কুণ্ডল, শৃঙ্খল প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র অঙ্গাভরণ পুরুষের ধার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূপতিদিগের বেশভূষা বর্ণনা উপলক্ষে উক্ত প্রকার কয়েকটী ভূষণের নাম পাওয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহৃত কতিপয় আভরণ কিছু কিছু রূপান্তরিত ও নামান্তরিত হইয়া পুরুষদিগের ধার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল।

প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের আভরণের মধ্যে নাসিকায় ধারণ করিবার কোন আভরণের নাম আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। যদি প্রকৃতই পুরাকালে কোন নাসিকাভরণের ব্যবহার না রহিল, তবে কোন্ সময় হইতে এ দেশে উহা প্রচলিত হইল, তাহা বলা কঠিন। নাকে ছিদ্র করিয়া বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে আভরণ ধারণের রীতি আছে, তাহা হয়ত মুসলমানদিগের সময় হইতে অথবা মুসলমান রাজত্বের কিছু পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম, কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

চোখের ভাষা।

তখন গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ণের অন্ধকার চারি দিকে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তখনও উত্তাপের হ্রাস হয় নাই। দিল্লীনগরীর প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহগুলি তখনও তীব্র তাপ বিকীর্ণ করিতেছে। সম্মুখের পথ হইতে তখনও তপ্ত বায়ু-তাড়িত ধূলিকণা পথচারী পথিকের দেহ দগ্ধ করিতেছে।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই দেখিয়া লাবণ্যবালা হস্তস্থিত পুস্তকখানি টেবিলের উপর

রাখিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। সমস্ত গৃহটী ধূলার আবরণে যেন ঢাকিয়া রহিয়াছে। মেজে ত ধূলিতে পরিপূর্ণ, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারী প্রভৃতি কিছুই বাদ নাই। ঝাঁটা লইয়া লাবণ্য তাড়াতাড়ি ধূলির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই বালিকা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সম্মার্জ্জনী বার বার তাহার কোমল হস্ত হইতে স্খলিত, হইয়া পড়িতে লাগিল। গৃহকাজ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। একটা অজানা ভাবনা তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বালিকার বড় অপরাধ ছিল না। গৃহকর্ম্মে সে একেবারেই অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ। এ পর্য্যন্ত তাহাদের সংসারে পরিচারিকার অভাব ছিল না। বিশেষতঃ তাহার পিতা সাহেবী-ধরণের লোক এবং ঘোর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি কন্যাকে শৈশব-কাল হইতেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া-ছিলেন। তাহার বাল্যকাল স্কুলে ও গৃহে শিক্ষকের নিকটেই অতিবাহিত হইয়া-ছিল। গৃহকাজ শিখিবার তাহার অবসর, অভিলাষ বা অনুমতি ছিল না।

কিন্তু চিরদিন অবস্থা কাহারও সমান যায় না। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইল। পিতার ব্যবসায় ফেল হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ঋণের দায়ে তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি, এমন কি বসতবাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গেল।

কৃতান্ত তাঁহাকে সমুদায় ভাবনা ও চিন্তা হইতে মুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহার পুত্র কন্যাকে ছাড়িল না। যতীন ও লাবণ্যবালা দুঃখের ভাবনায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। দাসদাসীদের বিদায় দিয়া তাহারা এক ভগ্ন কুটীরে কোন প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিল।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পিতার সময় হইতেই দূরসম্পর্কীয়া এক পিসি-ঠাকুরাণী তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন। লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার বরাবরই ঘনিষ্ঠতা, সুতরাং এ পরিবর্ত্তন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সময়ে অসময়ে আধুনিক দুর-বস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন, ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার আক্ষেপ বিলাপের জ্বালায় লাবণ্য নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। অধুনা পিসি-মাতার একান্ত অভিলাষ যে, লাবণ্যবালা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া তাহাদের এ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পায়। যতীনের উন্নতির আশা তিনি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দে শয়নকক্ষটী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পিসিমা ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, মূল্যবান্ আয়নাখানি লাবণ্যের হস্তচ্যুত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

"লাবণ্য কি করলি রে? এমন আর্শি কি আর পাবি? সে কাল কি আর আছে বাছা, যে একখানা ভেঙ্গে গেলে আর একখানা নূতন আসবে?"

লাবণ্য নীরবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভর্ৎসনা বৃথা বুঝিয়া লাবণ্যের পিসিমাতা অন্য কথা পাড়িলেন, "হাঁরে, যোগেশ বাবু এখন আর আসেন না কেন? আগে ত তিনি রোজই এ বাড়ীতে আস্‌তেন। ক'র না বাপু, তাঁকেই বে' ক'র না। তোদের এ অবস্থা দেখ্‌লে যে বুক ফেটে যায়।"

এমন সময় যতীন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কি, পিসিমা! সেই যোগেশ বাবুর কথা! আমি ত অনেক দিন বলেছি, যোগেশ বাবুর সঙ্গে লাবণ্যের বে' হ'তে পারে না। তিনিই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছেন।"

"কেন রে, তিনি তোদের সর্ব্বনাশ করলেন কি ক'রে? বরং তোর বাপ্‌কে টাকা ধার দিয়ে যোগেশ বাবু তোদের উপকারই করেছেন।"

"বটে, তিনিই আমাদের ফাঁকি দিয়ে এখন আমাদের বাড়ীটি ভোগ করছেন।"

"সে কি কথা রে? তোদের বিষয়-আশয় সব বিক্রী হ'য়ে গেল, যোগেশ বাবু তাই বাড়ীটা কিনে নিলেন। তোদের কি ও বাড়ী থাকৃত? যোগেশ বাবু না নিলে অন্য কেহ নি'তই নিত, তখন কি হ'ত ব'ল্ দেখি? এখন যদি কেবল তোরা মত করিস্, তবে লাবণ্যের বাড়ী লাবণ্য আবার ফিরিয়ে পায়।"

লাবণ্যের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তর্ক নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া যতীন বাহিরে চলিয়া গেল। পিসিমাতা বলিতে লাগিলেন, "আহা! যোগেশ বাবু আমার কাছে তোর কত সুখ্যাতি কর্‌তেন। তাঁকে বে' কর্‌তে তোরা অমত করছিস্ কেন?"

লাবণ্য এবার বলিল "পিসিমা, তুমি আমাকে বিক্রী করিবে না কি?"

পিসিমাতা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোদের যেমন কথা! রূপে, গুণে, ধনে, বিদ্যায় যোগেশ বাবু কিসে কম? এমন বর পাওয়া তোর ভাগ্যের কথা।"

লাবণ্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। গৃহ-কর্ম্ম তাহার আর ভাল লাগিল না। অধীর হইয়া সে বারান্দায় পাদচারণা করিতে লাগিল। তখন বায়ুর লেশমাত্র ছিল না, গাছের পাতাগুলি স্থির নিস্তব্ধ হইয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই বায়ুহীন, সঙ্গিহীন, নীরব সন্ধ্যা বালিকাকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিল।

পিতার সেই সুন্দর রাজপ্রাসাদ সদৃশ অট্টালিকা, সেই প্রশস্ত পুষ্পসমন্বিত উদ্যান, সেই শ্যামশষ্পমণ্ডিত বিস্তৃত প্রান্তর, সেই স্নিগ্ধ-বায়ু-কম্পিত বটবৃক্ষ, তাহার মনে পড়িল। হায়! ইহা অন্যের ভোগ্য, এখন যোগেশ বাবু সেই প্রশস্ত বৃক্ষতলে সুশীতল সমীরণ উপভোগ করিতেছেন! হঠাৎ একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসিল 'সত্যই কি যোগেশ বাবু আমাকে ভালবাসেন?'

'কখনই নয়। তাহা হইলে তিনি কি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেন, না আমাদের বাড়ী কাড়িয়া লইতেন? আর কেনই বা তিনি আমাকে ভালবাসিবেন? কত রূপবতী ধনিকন্যা তাঁহার জন্য লালায়িত!

আমি কে? আর আমিই বা আমার শত্রুকে বিবাহ করিব কেন? আমরা গরীব বটে, কিন্তু অর্থের প্রত্যাশী নই?"

ভাবিতে ভাবিতে বালিকা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। সহসা লাবণ্য দেখিল, অদূরে রাজপথে যোগেশ বাবু আসিতেছেন। তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। লজ্জায় ও ঘৃণায় লাবণ্য ছুটিয়া পলাইল।

যোগেশ বাবু ধীরে ধীরে তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। পিসিমাতা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

পিসিমা! আপনারা এই বাড়ীতেই আছেন? আমি কত খুঁজেছি, কিন্তু আপনাদের কোন সন্ধান পাই নি'। যতীন লাবণ্য সব কোথায়?"

"যতীন বেড়াতে গেছে। আমি লাবণ্যকে ডাক্‌ছি।"

যতক্ষণ সম্ভব লাবণ্য বিলম্ব করিল। কিন্তু যখন পিসিমার ঘন ঘন চীৎকারে ভগ্ন গৃহটী কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন আর লাবণ্য অধিক বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল না। আপনাকে সমাহিত করিয়া লাবণ্য বসিবার গৃহে প্রবেশ করিল।

লাবণ্য আসিলে যোগেশ বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। লাবণ্য করস্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র গ্রীবা অবনত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

মর্ম্মাহত হইয়া যোগেশ বাবু বলিলেন, "আপনি কি আজ আমার সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ডও করিবেন না?"

উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাবণ্য হস্ত প্রসারণ করিয়া যোগেশ বাবুর সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড করিল। অবসর বুঝিয়া পিসিমা সরিয়া পড়িলেন।

"আপনি আমার উপর রাগ ক'রেছেন কেন? আমি কি কিছু দোষ ক'রেছি?"

যোগেশ বাবু শুনিয়াছিলেন যে, ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়েই তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের রাগের কারণ তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

লাবণ্য কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখে হাসি আসিল না। অগত্যা বেচারাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

"আমি অনেক দূর হইতে আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি। অনেক দিন ধরে আপনাদের সন্ধান ক'রেছি। কেন আপনি আমার উপর বিরক্ত হ'লেন?"

লাবণ্য প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার সজীবতার বড় লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। কেবলমাত্র তাহার বিস্ফারিত আরক্ত লোচন হইতে বিদ্যুদগ্নি বিস্ফুরিত হইতেছিল। সংশয়ে ও আবেগে বালিকার অন্তর কাঁপিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, যোগেশ বাবুর ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ের কপটতা অনেক দিন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তাহারা দরিদ্র বলিয়া আজ তিনি অসহায় দীন বালিকাকে কি পরিহাস করিতে আসিয়াছেন? এই দারুণ

কল্পনা তাহাকে প্রস্তরমূর্ত্তির মতই বিবর্ণ করিয়া তুলিল।

"আমি কি হিংস্র পশু ? কেন আপনি আমাকে অমন করে দেখ্‌ছেন ? আমাকে যদি আপনার এতই মন্দ মনে হয়, তবে আমি এখনই যাচ্ছি। কেবল বলুন, আপনি আমার উপর রাগ করিলেন কেন ?"

লাবণ্য তথাপি নীরব, বাক্যহীন। কম্পিত-কণ্ঠে যোগেশ বাবু বলিতে লাগিলেন, "আপনার আশায় আমি এত-দিন এখানে আছি। আপনাদের বাড়ীতে আপনি থাক্‌বেন বলেই আমি বাড়ীটা কিনে রেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন সেই শূন্য বাড়ীটা আপনাদের জন্য আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌চে ?"

লাবণ্য আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না। সে বলিল "আমরা গরীব বটে, কিন্তু আমরা লোভী নই। আপনি কি মনে করেন, বাড়ীর জন্য, টাকার জন্য, আমি আপনাকে বিবাহ করিব ? আমাকে কি আপনি এতই নীচ, তুচ্ছ মনে করেন ? আপনাকে আমি ভাল বাসিতে পারিব না। সুতরাং বিবাহ অসম্ভব।" তীব্র উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"আপনারা গর্ব্বিত, সে আমি বেশ্ জানি। কিন্তু আশা করিয়াছিলাম, আপনারা অবুঝ নন। যাক্ সে কথা। আজ আপনার নিকট শেষ বিদায় লইয়া চলিয়া যাইব।"

বারিবর্ষণের পর মেঘ যেমন অনেকটা লঘু হইয়া আসে, হৃদয়ের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া লাবণ্য সেইরূপ অনেকটা শান্ত হইল। ধীরে ধীরে কহিল, "কেন, আপনি এখান থেকে যাচ্চেন না কি ?"

"আমি সুন্দরবনে যাচ্চি। আমরা ক'জন বন্ধু মিলে সুন্দরবনে বসবাস কর্‌ব, ঠিক করেছি।"

"সত্যি ? কিন্তু শুনেছি সে বনে বড় ম্যালেরিয়া। অনেক হিংস্রজন্তুও সেখানে আছে।"

"হাঁ, এর মধ্যেই আমার বন্ধুর দুইজন লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে।"

"তবে, হঠাৎ আপনারা সেখানে যাচ্চেন কেন ?"

"দেখি যদি আমরা সে দেশের উন্নতি কর্‌তে পারি। আর যদি এ চেষ্টায় আমাদের জীবন যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি ?"

কেন, এখানেই ত আপনাদের অনেক কাজ আছে। দূরদেশে গিয়া আপনাদের মূল্যবান্ জীবন বিপদগ্রস্ত কর্‌বেন কেন ?"

বিপদ ! বিপদ ত আমা দের আমোদ। একটা ত কিছু চাই ?"

"আপনাদের অভাব কি ?"

"অভাব—কি নাই বলুন। সে যা'ক, তাহ'লে আপনি সুখে থাক্‌বেন। আপনাকে আর আমি বিরক্ত কর্‌ব না। আর আমার ফিরিবার আশা করবেন না।" তাঁহার স্বরে আবেগের আভাস ছিল।

লাবণ্যের মনে আবার সেই সমস্যা ঘুরিয়া আসিল। যোগেশ বাবু কি যথার্থই আমাকে ভালবাসেন? তিনি কেন সহসা স্বদেশ, আত্মীয়, পরিজন পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসনে যাইতেছেন? কেন তাঁহার সুখময় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া তিনি বিপদকে বরণ করিতেছেন? এতটা আত্মত্যাগ কি কেহ কখন বিনা কারণে করিতে পারে?

তাহার মনে হইল, হয় ত সে যোগেশ বাবুকে ভুল বুঝেছে! যদি সত্যই তাঁহার কথার ভিত্তি না থাকে, তবে তিনি তাহার সন্ধানে এ বাড়ীতে আসিবেন কেন, এমন করে তাহার স্তবস্তুতিই বা করিবেন কেন? যোগেশ বাবুর প্রতি তাহার বিশ্বাস অনেকটা ফিরিয়া আসিল। তাহার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক হইল। সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "আপনারা কবে যাবেন? আবার ফিরিবেনই বা কবে?"

"ফিরিবার বড় আশা নাই। আমার জন্য আপনার কি কোন কষ্ট হবে?"

কষ্ট যে তাহার হইবে না, এ কথা বলিতে লাবণ্যের এবার বাধিয়া গেল, সে নিরুত্তর রহিল।

কুহেলিকাচ্ছন্ন সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক সূর্য্যের প্রথম রশ্মি দেখিলে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, ব্যর্থ-মনোরথ যোগেশ বাবু লাবণ্যের সেই লজ্জাবনত মুখ দেখিয়া তেমনি প্রফুল্ল হইলেন।

"আমি চ'লে গেলে ত আপনার সুবিধাই হবে। আপনাকে আর বার বার বিরক্ত করিতে আস্‌ব না।"

"না, না, আপনি মিছামিছি দেশত্যাগী হবেন কেন?"

"এখানে থেকেই বা কি কর্‌ব বলুন? এ ব্যর্থ জীবন কেমন করে কাটাব।"

লাবণ্য কোন কথা কহিল না। যোগেশ বাবু বলিতে লাগিলেন, "আপনি যদি আশা দেন, আপনি যদি আমাকে সুখী করেন, তবেই আমি এখানে থাকি।"

লাবণ্য পূর্ব্ববৎ বাক্যহীন। যোগেশ বাবু সাহসে ভর করিয়া লাবণ্যের হাতখানি ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "কি বলুন?" লাবণ্য অস্ফুটস্বরে কি বলিল তাহা বড় কিছু বুঝা গেল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের ভাব যোগেশ বাবুর নিকট অবিদিত রহিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "তাই ত আমার বন্ধুকে আমি কথা দিয়েছি। আমি ভাব্‌ছি, সে যদি আমাকে না ছাড়ে, তবে আমাকে সুন্দরবনে ত যেতেই হবে।"

লাবণ্য এতক্ষণে ধরা দিল। বলিল, "কোন রকমে কি এ দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না?"

"আপনি যদি বলেন ত তাকে এখনি টেলিগ্রাম করে দিই।"

"বেশ ত, তাই করুন না।"

যোগেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন "কিন্তু আমার পুরস্কার চাই।" (ক্রমশঃ)

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

দুই বৎসর পূর্ণ হইল ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় স্ত্রী-মহামণ্ডলের মেম্বরগণের অনেক নূতন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইয়াছে। আমাদের দেশের অন্তঃপুর-বাসিনীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক শুধু তাহা নহে, উহা এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকালকার স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বকার নারীদের অনেক-গুলি গুণ হারাইয়াছেন, আর এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষারও সারটুকু ধরিতে পারেন নাই। কাজেই অজ্ঞতা, বিশৃঙ্খলা, সময়ের অপব্যবহার প্রভৃতি দোষ আসিয়া অনেক সংসারে ঘোর প্রমাদ ঘটায়। আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে যেরূপ শিক্ষার উন্নতি ও সুযোগ হইয়াছে, মেয়েদের মধ্যে সেইরূপ না হওয়াতে উভয়ে একত্র সংসারপথে চলিবার সময় পরস্পরের সঙ্গে সেরূপ সামঞ্জস্য বা মিল হয় না। আমাদের অনেক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা নিজ নিজ স্ত্রীকে কেবল সন্তানের ধাত্রী (nurse) স্বরূপ ভাবিয়া থাকেন—তাঁহাদের সঙ্গে না কোন একটা সাধারণ বিষয়ের কথা, না একটা জ্ঞানের কথা বলিয়া সুখ পান। এটা কি আমাদের ভাবিবার ও মাথা হেঁট করিবার কথা নহে? বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে যুবকদের মনে অনেক নূতন ভাব আসিয়াছে, নিজ নিজ স্ত্রীকে পুরাকালের ন্যায় যথার্থ সহধর্ম্মিণী করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতরূপে শিক্ষিতা স্ত্রী না পাইলে তাহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইবার আশা কোথায়?

ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের স্থাপয়িত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী বর্ত্তমান কালের এই সমস্যার কিরূপে মীমাংসা করিবেন, বহুদিন ধরিয়া তাহা চিন্তা করিয়া এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি এখন বাড়ীতে বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী পাঠাইয়া বিবাহিতা মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সুযোগ পাইয়া কন্যা ও বধূদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কলিকাতার সর্ব্বত্রই এই স্ত্রী-মহা-মণ্ডলের শিক্ষয়িত্রীগণ পড়াইতেছেন। বৎসর বৎসর এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্রের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত বার্ষিক রিপোর্ট পড়িলে পাঠকপাঠিকাগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

বিগত ১২ই জানুয়ারী এই সমিতির কলিকাতাস্থ শাখার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলারা সভায় উপস্থিত

ছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০০ শত জন মেম্বর ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে স্থানীয় সেক্রেটরী কর্ত্তৃক ১৯১২ সালের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পঠিত হয়, উহার মর্ম্ম এই—যদিও এখনও সমিতির অঙ্কুর অবস্থা মাত্র,তথাপি ইহা গত বৎসর সুচারুরূপে অন্তঃপুর-শিক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে। প্রথম বৎসর ২১৯৪ টাকা আয় হইয়াছিল, কিন্তু বিগত বৎসর ৬৫০১৲ টাকা আয় হইয়াছে। প্রথম বৎসর সমিতির ২৮৪২৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, গত বৎসর ৭৩৭৯৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সমিতি আট শতাধিক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর আয় প্রায় তিন গুণ হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, সমিতি স্বীয় কার্য্যকলাপে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার সভ্যসংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত বৎসরের মধ্যে প্রায় ১২৫ জন ছাত্রীকে ২২ জন শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অন্তঃপুরে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। বৎসরান্তে যাহাতে নিয়মিতরূপে ছাত্রীগণকে পরীক্ষা করা হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাঁহারা সমিতির সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কোন প্রকার সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেক্রেটারী রিপোর্ট সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য অন্তঃপুর-শিক্ষার ন্যায় বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষাও যে অতি প্রয়োজনীয়, তাহা সমিতির মেম্বরগণের উপলব্ধি হওয়ায় ছোট ছোট মেয়েদের জন্য 'স্ত্রী-মহামণ্ডল বালিকা-বিদ্যালয়' নামে একটী স্কুল খোলা হইয়াছে। ইহা ১৪নং শ্রীনাথ দাসের লেনে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির কয়েকজন সভ্য টেবিল, ঘড়ী, বোর্ড,মানচিত্র, বাক্স প্রভৃতি স্কুলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি দান করিয়াছেন। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার পূজার দালানে স্থান ও চেয়ার বেঞ্চ প্রভৃতি দিয়া স্কুল স্থাপনের সাহায্য করেন। এক বৎসরে ৬০টী বালিকা ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের বয়স ৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত। সকল ছাত্রীকে উৎসাহ দিবার জন্য এ বৎসর প্রত্যেককেই পুরস্কার বা উপহার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ২টী বালিকা ২টী রৌপ্য-পদক পাইয়াছে। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সমিতির কতিপয় মেম্বর প্রাইজের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। মহোদয়া সেক্রেটারী স্কুলের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর কতকগুলি ছোট ছোট বালিকা গীতাভিনয় করিল, তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীমতী সরলা দেবী একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন এদেশীয় স্ত্রীজাতির মধ্যে যে একটা কাজ করিবার উৎসাহ জন্মিয়াছে, ইহার সুফল এই স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্য এত দ্রুত বিস্তার দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ইনি

সমিতির দ্বারা আহূত হইয়া অল্প দিনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। সভানেত্রী মহাশয়া পারিতোষিক বিতরণ করিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ভার পুরুষদের উপরই ন্যস্ত ছিল, কিন্তু এখন স্ত্রীজাতি যে নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন ও ইহার যে এত শীঘ্র এরূপ উন্নতি হইয়াছে, ইহা আমাদের দেশের ও নারীজাতির অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের স্বাস্থ্যলাভ—শুনা যাইতেছে, ডেরা-ডুনের জলবায়ুর গুণে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। এ সংবাদে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। ভগবান্ অচিরে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করুন।

ছোট লাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার বাহাদুরের পরলোক গমন—বিগত ২৮শে মার্চ্চ আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী চেল্টেনহাম নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম বঙ্গের ছোট লাটের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শনার্থ বাঙ্গালার অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি বন্ধ করা হইয়াছিল।

কারাগারে রোগীর ব্যবস্থা—মিঃ ম্যাকেন্না এক নূতন বিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কারাবরুদ্ধ কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহাকে প্রয়োজন মত নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুক্তি দেওয়া আবশ্যক। এই বিধান মঞ্জুর হইলে কয়েদিদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার্থ দান—কানপুরের পরলোকগত সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জানকী বাই কানপুরে একটী প্রথম শ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এরূপ সৎকার্য্যে সম্পত্তি দান অতীব প্রশংসনীয়।

সম্রাটের কৃষিকার্য্যে আগ্রহ প্রকাশ—শুনা যাইতেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া একটী ভূমি ক্রয় করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদ করিবার ব্যবস্থা

করিতেছেন। বঙ্গের জমীদারবৃন্দ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের এই সংকার্য্যের অনুকরণ করিলে ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে দান—শুনা যাইতেছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিবেন।

সন্ধি—তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ সন্ধি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনের দেহত্যাগ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ১৯শে চৈত্র সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় তিনি ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যান। সহসা একখানি বেঞ্চে বসিয়া ঢলিয়া পড়েন, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। এরূপ মৃত্যু অতি শোচনীয়। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান ও পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

নব বর্ষের নিবেদন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন বামাবোধিনী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার স্বর্গীয় প্রবর্ত্তককে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এবং উপকারিতা বিষয়ে কত কথাই লিখিতে হইয়াছিল! আজিকার দিন এবং সেই দিনে কত প্রভেদ! সুশিক্ষিত লোকদিগের মুখে এখন আর স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূলে বড় অধিক কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না। অতি অল্পমাত্র-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আপনাদের স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। যে অন্তঃপুর-চারিণীগণ আমাদের ভক্তি, স্নেহ, আদর প্রভৃতির পাত্রী, তাঁহারা শিক্ষিতা না হইলে আমরা নিজেরাই অসুবিধায় পড়ি, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে না পারিলে আমরা এখন লজ্জিত হই এবং যেখানে তাঁহারা সুশিক্ষিতা, সেখানে গার্হস্থ্য সুখ অধিকতর বলিয়া অনুভব করিয়া থাকি। মহিলাদিগের জন্য পরিচালিত একখানি মাসিক পত্র স্থায়ী করিবার জন্য এক সময়ে কত চেষ্টা এবং কত সাধনাই করিতে হইয়াছিল! কিন্তু এখন ঈশ্বর-কৃপায় স্ত্রীপাঠারূপে অনেক পত্র ও পত্রিকা স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে। যে সেবাব্রত লইয়া বামাবোধিনীর জন্ম, সে সেবাব্রত আজ

অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত হই বটে, কিন্তু তাহাতে বামাবোধিনীর কর্ত্তব্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

সুশিক্ষালাভের জন্ত যে সকল নারীর মন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এখন তাঁহাদিগের যথোচিত শিক্ষা এবং উন্নততর মনের ভাবের অনুরূপ সাহিত্য উপহার দেওয়া বড় সহজসাধ্য কর্ম্ম নহে। এখন এক দিকে স্বদেশীয় ভাষা প্রভৃতিতে সুশিক্ষিতা অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ, অন্য দিকে বহুবিদ্যায় সুশিক্ষিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কারস্বরূপিণী নারীগণ—এই দুই শ্রেণীর, অথবা বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিতা বহুশ্রেণীর মহিলাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য মাসিক সাহিত্য প্রচার করা নিতান্ত সহজ নয়। যে শ্রেণীর সাহিত্য এখন সুশিক্ষিত পুরুষদিগের জন্য সৃষ্ট হইতেছে, সেই শ্রেণীর সাহিত্য রমণীদিগের জন্যও উপস্থাপিত করিতে হইলে, তাহাতে সহজবোধ্য বিবিধ জ্ঞানের কথা সঙ্কলিত করিতে হইবে, তাহা না হইলে তদ্দ্বারা সকল শ্রেণীর পাঠিকাদিগের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে পারা যাইবে না।

গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমি এই পত্রিকার লেখকশ্রেণীতে প্রথম অন্তর্নিবিষ্ট হই। সে আজ ৩২ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কাজেই বলিতে পারি যে, বামাবোধিনীর বর্ত্তমান লেখকবর্গের মধ্যে আমি প্রাচীনতম না হইলেও উহার একজন প্রাচীন লেখক বটে। সেই প্রাচীনতাটুকুর বলে এই নব বর্ষে আমি এই পত্রিকার লেখক এবং পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, পরিবর্ত্তিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সুপ্রবর্ত্তিত সাহিত্যসেবার পথে অগ্রসর হউন।

এখনও যখন বামাবোধিনীর একটা বিশিষ্টতা এবং বিশেষত্ব রক্ষা করিবার আছে, তখন তাহার অনুরূপ উপাদানসংগ্রহে আগেকার মত উৎসাহই প্রবল রাখিতে হইবে। দৈনন্দিন গৃহকর্ম্মে ও সন্তানপালন প্রভৃতিতে এত জ্ঞাতব্য তথ্য জানিবার আছে যে, তাহা কোন উন্নত যুগেই উপেক্ষিত হইতে পারে না। বিজ্ঞান শাস্ত্রের বড় বড় আবিষ্কার এবং তাহা লইয়া আলোচনা অতি বড় শিক্ষিতদিগেরও অদৃষ্টেও ঘটিয়া উঠে না। আমরা যদি সেই প্রকার বড় বড় তত্ত্বের কথার দোহাই দিয়া ক্ষুদ্র বলিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত প্রতারিত হইব। গৃহস্থের জীবন যাপনের জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার কথা অনেক মহিলার অভিজ্ঞতা হইতে এত সংগৃহীত হইতে পারে যে, বড় বড় বিজ্ঞানাচার্য্যেরাও তাহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন। প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের এ দেশের সমাজ এতদিন যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক অনেক বিষয়েরই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নারীসমাজে আবদ্ধ রহিয়াছে। নারীকে অবলা বলিলেও এ সকল বিষয়ে চিরকালই "পৌরস্ত্রীণাং প্রগল্‌ভতা" মাত্র

হইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র কথা বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া মহিলারা যাহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের কথা দশ জনের উপকারের জন্ম প্রচার করেন, তাহার জন্য আমরা সাগ্রহে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

সাহিত্য কেবল মার্জ্জিত ভাষার বাছা-বাছা শব্দের সংযোজনপ্রণালী নহে, কেবলমাত্র বচনরচনার বাহাদুরি লইয়া সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। যে জ্ঞান আমাদিগের গৃহধর্ম্মের সহায়, চরিত্র-গঠনের অনুকূল, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে নারীর যে বিশেষত্ব আছে, তাহাই বিশেষ করিয়া বিকশিত করিবার জন্য এই পত্রিকায় নারীরচনা বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হয় এবং তাহার জন্য একটি বিশেষ স্থান রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যাহাতে ঐ স্থানের লেখা কেবলমাত্র দুই চারিটি কবিতা রচনায় পর্য্যবসিত না হয়, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে লেখিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

অষ্টম অধ্যায়।

লাটিনদিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ।

১। ৪১৪ রোমাব্দে লাটিনদিগের সহিত রোমক জাতির দ্বিতীয় সংগ্রাম হয়।

২। প্রথম যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি লাটিনেরা রোমের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। রোমের সমুদায় সৈন্যের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ লাটিন ছিল এবং তাহারা নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমকদিগের মহিমা বর্দ্ধন করিয়াছিল। অতএব তাহারা রোমের নগরবাসী ও সেনেটরদিগের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য রোমকদিগের নিকট প্রার্থনা করিল।" কিন্তু সেনেটরেরা সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, সুতরাং লাটিনেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল (ক)।

৩। প্রথমে দুই জাতিতেই তুল্য বলে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরে ভিসুভিয়াস পর্ব্বতের নিকট যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে লাটিনেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া রোমের অধীনস্থ হইল।

(ক) বিগত ১৮৫৭ ও ৫৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে ইংরাজ রাজপুরুষেরা যেরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, সুশিক্ষিত লাটিন সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে রোমকেরাও সেইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

সামনাইটদিগের সহিত যুদ্ধ।

১। খৃঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে এবং রোম-স্থাপনের ৪১০ বৎসর পরে,সামনাইটদিগের সহিত রোমকদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়।

২। ইটালীর অন্তঃপাতী কাম্পেনিয়া দেশের লোকেরা সামনাইটদিগের ভয়ে রোমকদিগের শরণাপন্ন হয় এবং তাহারাই রোমকদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে।

৩। এই যুদ্ধ ক্রমাগত ৫০ বৎসর চলিয়াছিল। প্রথমে দুই বৎসর যুদ্ধ হইয়া সন্ধি হয়। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে দ্বিতীয় বার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে রোমীয় সেনাগণ পার্ব্বতীয় যুদ্ধে অশিক্ষিত থাকাতে সামনাইট-সৈনাপতি পোন্টিয়সের হস্তে পরাভূত ও অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিল।

৪। কিন্তু রোমীয় সেনাপতি মহাবীর পপিরিয়স কর্সর সামনাইটদিগকে বারম্বার পরাভূত করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন।

দশম অধ্যায়।

টরেন্টিয়দিগের সহিত যুদ্ধ।

১। টরেন্টিয়েরা রোমকদিগের জাহাজ সকল লুট করিয়াছিল। ইহাতে রোমকেরা এই উপদ্রবের কারণ জানিতে পারিয়া তাহাদিগের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দেন। অত্যাচারীরা কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া দূতকে নানা প্রকারে অপমান করে। ইহাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

২। টরেন্টিয়েরা সাহায্যের জন্য গ্রীসের অন্তর্গত ইপাইরসের রাজা পিরহসকে আহ্বান করিল। তিনি খৃঃ পূঃ ২৮০ অব্দে ইটালীতে আসিয়া পাণ্ডোসিয়া ও আস্কুলমের রণক্ষেত্রে রোমকদিগকে বারম্বার পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বেনিভেন্টমের শেষ যুদ্ধে তিনি এককালে নিঃসৈন্য ও পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

৩। তৎপরে রোমানেরা টরেন্টিয়, সলেন্টাইন ও ইটালীর দক্ষিণস্থ অন্যান্য জাতিকে জয় করিল। ইহার অনতি-বিলম্বেই সুবিখ্যাত পিউনিক মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

একাদশ অধ্যায়।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ।

১। রোমনগরস্থাপনের ৪৯০ বৎসর পরে এবং খৃষ্টের জন্মের ২৬৪ বৎসর পূর্ব্বে, "পিউনিক যুদ্ধ" অর্থাৎ কার্থেজের সহিত রোমের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কার্থেজের বর্ত্তমান ক্ষমতা দেখিয়া রোমের হিংসা প্রবল হয় এবং ইহাই এই সংগ্রামের মূলীভূত কারণ।

২। সিসিলির লোকেরা এই যুদ্ধের সূচনা করিয়া দেয়। প্রথমে মেসিনার লোকেরা ও সিরাকুজের রাজা হায়রোর পক্ষ হয়। এই যুদ্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিতেছিল। পরে রোমীয় সেনাপতি আপিয়স ক্লডিয়স আসিয়া মেসিনা অধিকার করিলেন। ইহাতে রোমক-দিগের সহিত হায়রোর যুদ্ধ ঘটিল। কিন্তু

তৎপরে হায়রো রোমের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং রোমের সহিত তাঁহার সকল বিবাদ ঘুচিয়া গেল। তৎপরে কার্থেজে ও রোমে সিসিলি লইয়া মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

৩। যুদ্ধের পঞ্চম বর্ষে রোমের কন্সল জুলিয়স ১৬০ খানা জাহাজের সহিত সুসজ্জিত হইয়া কার্থেজের সমুদ্রপোত সকল আক্রমণ করিল। ইহাতে রোমকদিগের জয়লাভ হইল এবং তাহারা বিপক্ষদিগের জাহাজ সকল কতক হস্তগত করিল ও অবশিষ্ট জলমগ্ন করিয়া দিল।

৪। এই প্রথম পিউনিক যুদ্ধ ২৩২৪ বৎসর চলিয়াছিল। পরে কেয়স লুটেসস দ্বিতীয় সামুদ্রিক যুদ্ধে কার্থেজের জাহাজ সকল ধ্বংস করাতে কার্থেজের পোতাধ্যক্ষ হানো সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

৫। রোমকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া ধার্য্য করিল যে, সিসিলি, সার্ডেনিয়া এবং ইটালী ও আফ্রিকার মধ্যস্থ সমস্ত দ্বীপ রোমকদিগকে দিতে হইবে, এবং যুদ্ধের ব্যয় পূরণার্থে কার্থেজিয়ানেরা ২০ বৎসর প্রতি বৎসর ১২০০ টেলন অর্থাৎ ২৪ লক্ষ টাকা রোমের রাজকোষে প্রদান করিবে (ক)।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

১। প্রথম যুদ্ধ শেষ হইবার ২৪ বৎসর পরে (খৃঃ পূঃ ২১৭ অব্দে) দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ হয়। কার্থেজ-সেনাপতি হানিবলের উচ্চাভিলাষ এবং রোমের প্রতি তাঁহার তাচ্ছিল্য ভাবই ইহার কারণ। তিনি স্পেন দেশের অন্তর্গত সেবান্টম-নামক রোমকদিগের একটী নগর অধিকার ও ধ্বংস করাতে এই যুদ্ধ ঘটে।

২। রোমকেরা আপনাদিগের মিত্ররাজ্যের দুরবস্থার কথা শুনিয়া কার্থেজীয়দিগের অত্যাচারের ও সন্ধিভঙ্গের কারণ জানিতে দূত পাঠাইল, তাহাতে কার্থেজিয়ানেরা যুদ্ধ করিব এই উত্তর দিল।

৩। কার্থেজ সেনাপতি অদ্বিতীয় বীর হানিবল তৎপরে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক পাইরেনিস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রোন নদী পার হইলেন। পরে আল্পস্ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া অসীম উৎসাহের সহিত রোমাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং টেসিনস, ট্রেবিয়া, থ্রাসিমনি ও কানি এই চারি স্থানে সম্মুখ সংগ্রামে মত্ত হস্তীর ন্যায় রোমীয় সৈন্য সকল দলন করিয়া জয়লাভ করিলেন। ইহাতে রোমে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিতে লাগিল এবং সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল যে, অবিলম্বে রোমের পতন হইবে, সন্দেহ নাই।

৪। কিন্তু রোমের সৌভাগ্যবশতঃ হানিবল আর অধিক কাল জয়শিখরে উত্থিত হইতে পারিলেন না। রোমানেরা স্বীকার করেন যে, হানিবল জয় করিতে

(ক) প্রথম পিউনিক যুদ্ধের ৬ বৎসর পরে কোন জাতির সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ না থাকাতে জেনস দেবের মন্দিরের দ্বার একেবার রুদ্ধ হয়।

যেরূপ জানিতেন, যদি সেই জয় রক্ষা করিতে এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সেইরূপ জানিতেন, তাহা হইলে রোমের সমূলোচ্ছেদ নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না।

৫। কেবিয়স, মাক্সিমিয়স এবং কনিষ্ঠ সিপিও এই তিন বীরপুরুষের দক্ষতায় রোম এ যাত্রা রক্ষা পাইল। হানিবলের নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণেও রোমের অনেক সুবিধা হইয়াছিল বলিতে হইবে। তিনি আপনার জয়পতাকা অবিশ্রান্ত উড্ডীয়মান না রাখিয়া সৈন্য-গণকে আমোদ আহ্লাদ করিতে অনুমতি দিলেন, সুতরাং রোমকেরা আপনাদিগের নিস্তেজ বল পুনরুদ্দীপ্ত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইল।

৬। হানিবল ইটালীতে ষোড়শ বর্ষ ছিলেন। পরে সিপিও তাঁহাকে ইটালীর বহির্ভূত করিবার মানস করিয়া বহু সংখ্যক সৈন্যের সহিত আফ্রিকাতে উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে যাহা পাইলেন ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ইহাতে হানিবল স্বদেশ রক্ষার জন্য আফ্রিকায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

৭। হানিবল আফ্রিকায় প্রত্যাগত হইলে জামা-নামক স্থানে খৃঃ পূঃ ২০১ অব্দে তাঁহার সহিত সিপিয়োর এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহাতে হানিবল সম্পূর্ণ-রূপে পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি স্বীয় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে নিরাশ হইয়া আসিয়ায় পলায়ন করিলেন। ইহাতেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং রোমকেরা সন্ধিপ্রস্তাবে যে যে আপত্তি করিল, কার্থেজিয়েরা তাহাই স্বীকার করিল।

৮। আফ্রিকার এই মহাযুদ্ধে জয়ী হওয়াতে সিপিও আফ্রিকেনস্ অর্থাৎ আফ্রিকাজিৎ এই উপাধি পাইলেন।

আদর্শরমণী স্বর্গগতা শ্রীমতী নীলমণি দত্ত চৌধুরী।

হিন্দুর গৃহে হিন্দুকুললক্ষ্মীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র পরিমিত হইলেও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের কার্য্য ও প্রভাব সমাজের উপর এত আধিপত্য স্থাপন করে যে, উহা লিপিবদ্ধ না হইলে সামাজচিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এইরূপ চিত্রাঙ্কনে আমাদিগের দেশে শিল্পী অতি বিরল। বোধ হয় হিন্দুরমণী-গণ চিরকাল অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ায় বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধের অভাবে এ কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার অবকাশ বড় শীঘ্র পাওয়া যায় না। আজ যাঁহার জীবনগাথা লিখিতেছি, তিনি ২৯এ চৈত্র, ১২৬৫ সালের নীলষষ্ঠীর দিনে

কোন্নগরে স্বর্গীয় ডাক্তার হরলাল মিত্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুভ দিনে কন্যার জন্মগ্রহণ হইল বলিয়া তাঁহার নাম হইল নীলমণি। সেকালে কোন্নগরে অভয়চরণ মিত্রের খুব প্রতিপত্তি ছিল। কুলে, শীলে, ধনে ও মানে সকলদিকেই অভয়চরণের 'বোলবোলায়' ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বসমেত সাতটি ভাই। চতুর্থ দিগম্বর মিত্র নিমকমহলের দারোগাগিরি করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অবাধে তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খাইত। শুনিয়াছি, পূজার সময় তাঁহাদের বাড়ীতে প্রতিমার সাজসজ্জা স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত হইত ও কয়দিন ধরিয়া বহু দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। যে প্রতাপ কেবল অর্থে আবদ্ধ থাকে, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, কিন্তু হৃদয়ের বিশালতায় যাহা সম্বদ্ধ তাহা প্রায়ই বংশপরম্পরায় চলিয়া আসে। জ্যেষ্ঠ অভয়চরণের প্রতাপ অনেকটা সেই শ্রেণীর ছিল। অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তিনি অর্থের জন্য কোন কার্য্যে কার্পণ্য প্রকাশ করিতেন না। যাহা শুভ, যাহা মঙ্গলকর, যাহা সাধারণের উপযোগী তাহা হইতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি দানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত, যোগ্যপাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কখনও বিমুখ হইত না। সাতটি ভাই সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ, নির্ম্মলস্বভাব, অহঙ্কারবর্জ্জিত ও পরোপকারী। সর্ব্বকনিষ্ঠ হরনাথ রূপে ও গুণে সংসার আলোকিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে উপর্য্যুপরি উচ্চবৃত্তি পাইয়া যখন শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তিনি সরকারী কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য মিউনিসিপালিটি বা লোকাল বোর্ডের পর্য্যবেক্ষণে ছিল না, এজন্য জ্বরের প্রকোপ সর্ব্বত্রই অনুভূত হইত। কাজেই এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইয়া, নানা ঘাটের জল খাইয়া, হরনাথের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘাবকাশ লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু নিয়তির নির্ব্বন্ধ কে অন্যথা করিতে পারে? কিছুদিন রোগশয্যায় থাকিয়া দুইটি পুত্র ও একমাত্র কন্যাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর হস্তে সমর্পন করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি শেষ বিদায় লইলেন। সংসারে তখন কেবলমাত্র তিনটি ক্ষুদ্র জীবন লইয়াই শোকাতুরা মাতা বাঁচিয়া রহিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আর কেহ কোথাও নাই। এ দুর্দ্দিনে সন্তান পালন কার্য্য সামান্য এক নিরক্ষরা হিন্দু বিধবার পক্ষে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু মাতার কোমল স্নেহ এমনি করিয়া ছেলেগুলিকে আর্দ্র করিয়া ফেলিল যে, তাহারা সেই কোমলতার মধ্য দিয়া উচ্চ জীবনের আদর্শগুলি স্বল্পায়াসেই বাছিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। শৈশবে কচি কচি হৃদয়ের ভাষা পরিস্ফুট করিতে মাতা যেমন দক্ষ, এমন আর কেহ নহেন। সন্তানের শিক্ষায় মাতা যে উচ্চ স্থান

অধিকার করেন, সে বিষয়ে আর কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। হরনাথের বিধবা পত্নী প্রখর বুদ্ধিচাতুর্য্যে সন্তানদিগকে সংশিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। কমলকোরক যেমন সূর্য্যদেবের স্নেহ-দৃষ্টিতে অল্পে অল্পে নয়ন মেলিয়া চাহে, এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূতা আমাদের পূজনীয়া নীলমণিও তেমনি করিয়া মাতৃশিক্ষা-প্রভাবে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ভালবাসিতে হয় কি করিয়া, পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয় কি করিয়া, দয়াধর্ম্মে অতুলনীয়া হওয়া নারীর সাধ্যায়ত্ত কি না, এ সমস্তই তিনি ক্রমশঃ মাতার নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সংসারে সকলের অপেক্ষা কনিষ্ঠা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ আদর করিত। পাছে তাঁহার অসুখ হয় এইজন্য তাঁহাকে ভাল জিনিস ভিন্ন কিছুই খাইতে দেওয়া হইত না। এখানে একটি গল্প মনে পড়িতেছে, সেটি বলিবার লোভসংবরণ করিতে পারিতেছি না। মিত্র-পরিবারের আর এক ঘরে তাঁহার জনৈক নিঃস্ব আত্মীয়া থাকিতেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল, সে বয়সে প্রায় নীলমণির সমান, কাজেই তাহারা দুই জনে এক সঙ্গে খেলা-ধূলা করিত। দয়ার্দ্রচিত্তা বালিকা খাবার পাইলে মুঠার ভিতর লুকাইয়া লইয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে তাহাকে খাওয়াইত। প্রায় নিত্যই এইরূপ হইত। এ যে কেবল খেলার সাথী বলিয়া তাহা নহে, বাড়ীর দাসদাসীদের মেয়েছেলেদিগকেও তিনি এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাহাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দৌড়িয়া গিয়া মাতার নিকট হইতে যাহা কিছু পাইতেন তাহাই আনিয়া তাহাদিগকে দিতেন। তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের লক্ষণ অতি শৈশব হইতেই পরিস্ফুট হয়। বস্তুতঃ নীলমণির শিক্ষা এইরূপ না হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি পরকে আপন করিয়া লইতে পারিতেন না।

কুমারী জীবনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই-বার যথেষ্ট সময় থাকিলেও কঠোর সমাজ-শাসনে হিন্দুর তাহা হইবার যো নাই। দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার বিবাহের চেষ্টা হইতে লাগিল। বঙ্গের নানা সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধও আসিল। কিন্তু তাহার কোনটাই মনোমত নহে বলিয়া কিছুই স্থির হইল না। এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীর উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্তবংশীয় ও শিক্ষিত পাত্র না পাইলে বিবাহ দিবেন না তাহাও মনঃস্থ করিলেন। কন্যার রূপলাবণ্য ও বংশমর্য্যাদায় আকৃষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অনেক সাধ্যসাধনাও আরম্ভ হইল। কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। শেষে আন্দুলের চৌধুরীবংশীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক উচ্চ-শিক্ষিত, সুদর্শন ও চরিত্রবান্ যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিল। উভয় পরিবারের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই জানা শুনা থাকায় খোঁজ খবর লইবার আবশ্যক হইল না। সম্বন্ধ

আসিতেই কর্তৃপক্ষ দেখিলেন এ উপযুক্ত অবসর। তখনকার দিনে চৌধুরীবংশের তেমন অর্থস্বাচ্ছল্য না থাকিলেও ছেলেটি যে "হীরার টুক্‌রা" সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। শুভ দিনে শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। পাত্রটির নাম শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত চৌধুরী। ইনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্‌ট্রান্স ও এফে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ও উচ্চ বৃত্তি পাইয়া ১৮৬৯ সালের বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার মত শান্ত, সুবোধ, পবিত্রহৃদয়, নির্ম্মলচিত্ত, সুপুরুষ তখনকার দিনে অল্পই পাওয়া যাইত। যাহাহউক, বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের ২৩এ আষাঢ় তারিখে আনন্দহিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে দুইটী উন্মুক্ত হৃদয় সংসারশৃঙ্খলে বাঁধা পড়িল, "রত্নং সমাগচ্ছতু কাঞ্চনেন"—মণি কাঞ্চনের যোগ হইল।

বিবাহের পরেই স্বামীর হস্তে তাঁহার শিক্ষা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। সীতার বনবাস, টেলিমেকস্, রামায়ণ, মহাভারত, নীলদর্পণ প্রভৃতি যে সমস্ত পুস্তক তাঁহাকে একবার পড়িতে দেওয়া হইত, তাহা প্রায় সবই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। এই সঙ্গে আর্য্যদর্শন, বামাবোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি অনেক মাসিক সাহিত্যও তাঁহার পাঠ্য ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রখর স্মরণশক্তির সাহায্যে ভাল ভাল প্রবন্ধগুলি স্বল্পায়াসেই তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। যাহা তিনি একবার পড়িতেন, জীবনে তাহা কখনও ভুলিতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামীর উপদেশবাক্যগুলি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অসীম স্বামিভক্তি ও অন্যান্য সদ্‌গুণরাশির পরিচয় পাইতে কাহারও অধিক বিলম্ব হইল না। স্বামীরও হৃদয় স্বতঃই নবপরিণীতা স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইল।

(ক্রমশঃ)

প্রভাত।

গিয়েছে আঁধার কালো, এসেছে দিনের আলো,
নিশি অবসান,
প্রভাত দেখিয়ে রাতি, বিহগ তুলিছে গীতি,
সুমধুর তান।
সাজিয়ে সোণার ছবি, উঠেছে নবীন রবি
আকাশের গায়,
কুসুমের তরুরাজি রয়েছে কুসুমে সাজি
সুচারু শোভায়।
তুলিয়া মধুর তান অলি করে মধু পান
গুন্ গুন্ রবে,
সুশীতল বায়ু আসি, ছড়ায়ে সৌরভরাশি,

মাতাইয়া জীবে,
মৃদু মন্দ সঞ্চালনে ছুটিছে আপন মনে
কাঁপায়ে ভলায়।
পাইয়া শিশিরজল সুশোভিত তরুদল
মণিমুকুতায়,
কুলু কুলু ধ্বনি করে, তটিনী বহিছে ধীরে
তুলিয়া লহরী,
ফুটন্ত কমলদলে হেলে দুলে কুতূহলে
প্রেমভরে মরি!
উর্দ্ধ মুখে আঁখি তুলে হেরিছে গগনকোলে
প্রাণ-দেবতায়,
সলাজে কুমুদরাশি, নিবায়ে মধুর হাসি
নয়ন লুকায়।
সুন্দর শ্যামল মাঠে রাখাল চলেছে গোঠে
লয়ে ধেনু পাল,
কেমন প্রফুল্ল মনে কৃষক মজেছে গানে
ধরে নিজ হাল।
প্রভাতের চারু হাসি স্বর্গীয় অমিয়রাশি
সুধার লহরী,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবলি সৌন্দর্য্য দেখি
জুড়ায় নয়ন ভরি।
মধুর সময় যেই সৃজন করেছে এই
পবিত্র উষায়,
ভক্তিভরে জুড়ি হাত কর জীব প্রণিপাত
সেই বিধাতায়।
শ্রীমতী মনোরমা রায়, পূরুড়া।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষ গুণ কি?

কোন্ সময় হইতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। আদিম আর্য্য-জাতির মধ্যেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রচলন শুনিতে পাওয়া যায়, এবং বৈদিক যুগেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুসমাজেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা প্রতি গৃহেই বিদ্যমান ছিল।

বর্ত্তমান কালে কেবল ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রচলন আছে কিনা জানি না।

বর্ত্তমান সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অবনতির কারণ ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা, এবং আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অভাব। প্রত্যেকেই স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারিলে, প্রত্যেকেই অপরের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, প্রত্যেকেরই উদার সরল অন্তঃকরণ না হইলে, একত্র বাস করা কষ্টকর বলিয়া মনে হয় এবং একত্র বাস করিলেও নানা প্রকার অশান্তিতে সংসার সুখশান্তিহীন হইয়া উঠে। একান্নবর্ত্তী পরিবার সকল প্রায়ই রমণীদিগের প্ররোচনায় পৃথক্ হইতে শুনা যায়। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে এবং কুশিক্ষার ফলেই নীচতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা দোষে সংসারে এরূপ বিপ্লব ঘটে। অন্যান্য কতকগুলি কারণেও

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে জীবিকার জন্য কর্ম্ম উপলক্ষে পুরুষদিগকে বিদেশে গমন করিতে হইত না, নিজেদের কৃষিকার্য্য আদি যাহা থাকিত তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, এখনকার মত সকল দ্রব্যই মহার্ঘ ছিল না, অতএব একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা ঘরে ঘরে বিদ্যমান ছিল। অধুনা জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত পুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া বিদেশে গমন করিতে হয়। একা একা বিদেশে বাস অত্যন্ত কষ্টকর, সুতরাং বাধ্য হইয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। বিশেষতঃ, রেলাদির বিস্তার জন্য গমনাগমনের সুবিধা হওয়াতে সকলেই সহজে বিদেশে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যাইতে পারেন। স্বতন্ত্রভাবে বিদেশে বাস করিতে করিতে এমনই কু-অভ্যাস হইয়া যায় যে, দীর্ঘকাল বিদেশ-বাস অন্তে যখন সকলে আবার একত্রিত হয়েন, তখন দূরে বাসের অভ্যাসে নানা অসুবিধা বোধ করেন এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে একান্নবর্ত্তী পরিবার লুপ্ত হইয়া যায়। মানব-চরিত্রগঠনে একান্নবর্ত্তী পরিবারের যেরূপ প্রভাব দেখা যায়, মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে, আত্মত্যাগ, সংযম, নিঃস্বার্থতা শিক্ষা দিতেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের তদ্রূপই প্রভাব। যাঁহারা ভিন্ন হইয়া একা একা বাস করেন, তাঁহাদের সে শিক্ষা আদৌ হয় না। জ্যেষ্ঠ তাতের পুত্রকে আপন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করা কিম্বা জ্যেষ্ঠ তাতের কন্যাকে আপন সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় মনে করিয়া স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখা একত্র বাস ভিন্ন পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে হইতেই পারে না। একত্র না থাকিলে প্রীতি ও মমতা আসাও অসম্ভব! একান্নবর্ত্তী পরিবারের একত্র থাকার নানা দোষ এবং অসুবিধা থাকিলেও ইহার কয়েকটি প্রধান গুণ আছে। মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজি নিঃস্বার্থতা, উদারতা, আত্মত্যাগ ও স্বাধীন ইচ্ছা দমনের ক্ষমতা, সংযম, পর-সেবা, পরের প্রতি দয়া। এই সদ্‌গুণ-রাশি একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিকশিত হইবার যেরূপ সুযোগ, অন্যত্র তদ্রূপ নাই। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"রাজার কখনও মৃত্যু নাই।" সেইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারও কখন সমূলে বিনষ্ট হয় না। একের অবর্ত্তমানে অপরে সেই পরিবারের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিধবা ভগ্নী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা প্রভৃতি আত্মীয়াদিগকে বৃদ্ধবয়সে জীবিকার জন্য অপরের দ্বারে যাইতে অথবা কোনরূপ কার্য্য গ্রহণ করিতে হয় না।

জগতে একাকী কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা যায় না। কেবল একার শক্তিতে কোন উন্নতির চেষ্টা করিলে অনেক সময় তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়, আর সফল হইলেও অধিক সময় লাগে, কিন্তু সকলে মিলিয়া একত্রীভূত হইয়া যে কার্য্য করা যায়, তাহা অতি শীঘ্র এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয়। একা একা থাকায় অনেক সময় রোগশোকাদিতে

নানা প্রকার অসুবিধা এবং কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অনেকের দেখিয়াছি বহুকাল একত্র থাকায় তাহাদের পক্ষে 'একা' থাকা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারই আমাদের দেশে জীবনবীমার অভাব দূর করিত বলিয়া বোধ হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষ এই যে, যদি বাড়ীর মধ্যে একজন উপার্জ্জনশীল হইলেন, তাহা হইলে অপর সকলে আত্ম-নির্ভরশীলতা ভুলিয়া যান। তাঁহাদের যে পুত্র কলত্র প্রভৃতির জন্য অর্থ উপার্জ্জনের আবশ্যক, ইহা একবারও মনে না করিয়া উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির উপরই সংসারের দায়িত্ব দিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে ও নিকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকেন। অনেকে উপার্জ্জন করিলে তাহা সংসারে দেওয়া আবশ্যকই মনে করেন না, সুতরাং কালে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। আলস্য যে কত দোষের, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উপসংহারে বর্ত্তমান সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের আবশ্যকতা আছে কি না, সে বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না; তবে আমার মনে হয়, যাঁহারা একান্নবর্ত্তী-পরিবার-ভুক্ত, তাঁহারা যদি প্রত্যেকেই অলস ও নিশ্চেষ্ট না হইয়া কর্ম্মক্ষম হয়েন এবং প্রত্যেকেই সংসারের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরল ও উদারচিত্তে আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই একান্নবর্ত্তী পরিবারে শান্তি ও সুখ আছে। ইহাতেও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক, কারণ গৃহরাজ্য রমণীদিগের দ্বারাই পরিচালিত। অতএব তাঁহারাও সেইরূপ আদর্শ রমণী হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতি গৃহেই অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজিত থাকিবে।

শ্রীচারুমতি দেবী।

নূতন সংবাদ।

১। এড্রিয়ানোপল তুরস্কের অধিকার-চ্যুত হইয়াছে। তুরস্কের এই বিপদে সমগ্র মুসলমানসমাজ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে।

২। হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবকাশ লইয়াছেন। তাঁহার স্থানে ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় মহাশয় নিয়োজিত হইয়াছেন।

৩। আমরা বঙ্গভূমির আর দুইজন কৃতী পুরুষকে হারাইলাম। সুবিখ্যাত গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় গত ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ৬৯ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী লোক অতি বিরল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ

সেন মহাশয়ও প্রায় এক বৎসর কাল দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ১২ই এপ্রিল শনিবার প্রত্যূষে ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অমরধামে গমন করিয়াছেন। ইহাঁদের লোকান্তরে বঙ্গবাসী সকলেই মর্ম্মাহত।

৪। তিব্বতদেশের চারি জন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পুত্র শিক্ষালাভার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিব্বত-দেশীয় আর কেহ শিক্ষালাভার্থ বিদেশ গমন করেন নাই।

৫। শুনা যাইতেছে, দিল্লীতে ১৯১৩ ও ১৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ করা হইবে। এই ১৬ লক্ষের মধ্যে ১১ লক্ষ টাকায় ভূমি ক্রয় করা হইবে এবং অবশিষ্ট ৫ লক্ষ টাকা গৃহাদিনির্ম্মাণে ব্যয় করা হইবে।

৬। শুনা যাইতেছে, আসাম গবর্ণমেণ্ট গৌহাটী হইতে সদিয়া পর্য্যন্ত এক নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিতে-ছেন। সম্ভবতঃ এই রেলপথ চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

৭। ময়মনসিংহের অন্যতম জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খাঁ হিন্দু শ্মশান-ঘাট বাঁধাইয়া দিবার জন্য ২২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৮। চাইল্ডার প্রণীত পালিভাষার অভিধানে যে সকল শব্দ বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা লইয়া একখানি অভিধান লিখিবার জন্য শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রকে এক বৎসরের নিমিত্ত মাসিক ১০০৲ টাকার বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

৯। কলিকাতার আউটরাম রোডের উত্তরাংশে ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড কার্জনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লর্ড কারমাইকেল এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

১০। মূকবধির বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রীমান্ অটলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মূক-বধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালীতে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মূক ও বধিরদিগের শিক্ষাপ্রণালীতে অভিজ্ঞ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বামারচনা।

নব বর্ষ।

কেন এলে নব বর্ষ! কে তোমারে
ডেকেছে?
কেউ কি আদর করে
ডাকিয়াছে প্রেমভরে,

বল বল কার তরে তব প্রাণ
ছুটেছে?
পলে পলে ধীরে ধীরে
ক্রমশঃ আসিলে ফিরে,

"এস বলে" তোমারে কি কেউ
দিব্য দিয়েছে ?
দিন রাত অবিরত
কলুর ঘানির মত
কেন বা ঘুরিছ এত, কে ঘুরিতে
বলেছে ?
প্রণয় নিগড় দিয়া
কেউ কি তোমায় হিয়া
যতনে সোহাগভরে চির তরে
বেঁধেছে ?
কার তরে আত্মহারা
যেনরে পাগল পারা
কার প্রেম সুধা পানে তব মন
মেতেছে !
হে নব বরষ তব এ কেমন ধারা,
নব বেশে বার বার
কর ধরা অধিকার,
সুখের হিল্লোলে কারো সতত
ভাসাও রে,
নিদারুণ দুখ দিয়া
কাঁদাও কাহারো হিয়া
কা'রে শোকানল তাপে জর জর
কর রে।
ভীষণ দুর্ভিক্ষ লয়ে এলে ধরা-
মাঝে রে ;
এবার অন্নের তরে
কত লোক যাবে মরে
এখনি ভরেছে দেশ হাহাকার
রবে রে।
হরি, হরি, কিবা হবে,
কেমনে সকলে রবে,
কি খেয়ে বাঁচিবে সবে তাই ভেবে
মরিয়ে।

শ্রীকুসুমলতা বসু।

নব বর্ষ

নবীন বরষ এসেছে ফিরিয়া,
ধরিয়ে নবীন সাজ।
নবীন হরষে সবার হৃদয়
মাতিয়ে উঠেছে আজ ॥
যে দিকে নিরখি, দেখি বিশ্বময়
নবীন সুষমা ভরা।
কোটী প্রণিপাত, চরণে তাঁহার,
যাঁহার সৃজিত ধরা ॥
কিন্তু একি ভাব ? দয়াময় তিনি,
তাঁর রাজ্যে অবিচার !
কেহ ভাসে সুখে, কারো বা নয়নে
বহে শোক-অশ্রু-ধার !!
তিনি কৃপাসিন্ধু, কি দোষ তাঁহার ?
আপন কর্ম্মের ফলে
কেহ থাকে সুখে, আনন্দে হাসিতে
কেহ ভাসে আঁখি জলে ॥
তাই আজ প্রভো ! কাতরা তনয়া
মাগিছে শরণ তব।
দূর কর তা'র, মনের সন্তাপ,
করুণায়, ভবধব !

শান্তিদাতা তুমি, দাও শান্তি প্রাণে,
মুছাও নয়ন জল।
তব নাম স্মরি, বিপদে বিষাদে,
পাই যেন হৃদে বল॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ, মাগুরা, খুলনা।

চট্টলা জননী।

(১)

সুন্দর জনমভূমি চট্টলা আমার,
বিধির অপূর্ব্ব দান সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার।
প্রাকৃতিক দৃশ্যে আহা! জুড়ায় নয়ন,
সৌন্দর্য্য সম্পদে যেন চির অতুলন।

(২)

কোথাও সুমেরুশ্রেণী সারি সারি শোভে,
তরু গুল্মে, ফুল ফলে ঘিরি নানাভাবে,
তারি প'রে ছোট বড় বিরাজে কুটীর,
শান্তিরূপা জননীর স্নিগ্ধ স্নেহ নীড়।

(৩)

কোথাও বিরাজে মঠ সাধু সন্ন্যাসীর,
সুকুমার ছায়াবৃত তরুবল্লরীর,
কপোত কপোতী তথা বসি নিরজনে,
মিলায় আপন গীতি সাধু স্তুতি সনে।

(৪)

কোথাও সুমেরুশিরে বহিছে নির্ঝর,
গম্ভীর নিনাদে তার পুলকে অম্বর,
তারি তালে নাচে শিখী কলাপচ্ছটায়,
বারিপান আশে মৃগ কৌতূহলে ধায়।

(৫)

কোথা বা বিপিন ঘোর নিবিড় আঁধার
শ্বাপদ, পন্নগ আদি করিছে বিহার,
মধুর ঝঙ্কারে পাখী মাতায় কানন,
কুসুম সুষমা বাসে করিছে মোহন।

(৬)

কোথা ছুটে গিরিসুতা সাগরের পানে,
এঁকে বেঁকে নানারূপে কুলু কুলু তানে,
তরঙ্গিণী সনে নাচে বক্ষ প'রে তার,
কত শত জলযান কত যে প্রকার।

(৭)

কোথা বা শস্যের ক্ষেত নয়নরঞ্জন,
পথের দুধারে আহা! করি সুশোভন,
নানা বৃক্ষে সুশোভিত দীঘি সরোবর,
সকলি সুন্দর মরি! সকলি সুন্দর।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 597. June, 1913.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫০ বর্ষ। ৫৯৭ সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। জুন, ১৯১৩ { ১০ম কল্প ২য় ভাগ॥

ঈশ্বর।

১

প্রেমময়!

ত্রিভুবনমাঝে নাথ বিশ্ব সুমঙ্গল

কি সুধা ঢেলেছ আহা,

বিমল করুণা-মাখা,

যখন যে দিকে চাই নিরখি কেবল।

২

তোমার আদেশে রবি পাইয়া কিরণ

কতই স্নেহের ভরে,

দেয় আলো চরাচরে,

জীবের জীবন রাখে তোমারি পবন।

৩

তোমারি গগনকোলে উজ্জল আভায়

তোমার ইঙ্গিতবলে,

শশী তারা শূন্যে চলে,

বিমল কৌমুদী ঢেলে ধরণীর গায়।

হে বিভো মঙ্গলময় করুণা-সাগর!

তোমার প্রেমের ধরা,

কেবল সৌন্দর্য্যভরা,

গাহিছে তোমার জয় সাগর ভূধর।

৫

তোমারি নন্দনবনে ভোমরায় গায়

তুমি নাথ দয়া করি,

কুসুমেতে সুধা ভরি,

সাজায়ে রেখেছ বনে কনকলতায়।

৬

ঢেলেছ মাধুরীরাশি বিমল উষায়

নিতি ফুটে ফুলদল,

বন করে সমুজ্জল,

(যবে) তরুণ অরুণ ফুটে সোণালি

ছটায়।

৭

ছড়াইয়া সুধারাশি বসিয়ে শাখায়
বিহঙ্গ ললিত তানে,
উচ্ছ্বসিত প্রেমগানে,
তোমারি মহিমা বিভো! মানবে শোনায়।

৮

যখন বরষে মেঘ মুকুতা ধারায়
নাচে শিখী ভেকদল,
পাইয়ে নবীন জল,
আকুল কাকলি তুলি তব গুণ গায়।

৯

উথলে তটিনী সুখে ঘন বরষায়
তোমারি বসন্ত-বায়,
কোকিল পাপিয়া গায়,
প্রকৃতি ধরেন সাজ শ্যামল পাতায়।

১০

ছড়ায়ে কনক-ধারা চাঁদের গগনে
শারদ কৌমুদী এলে,
হাসাও কুমুদ দলে,
নাচাইয়ে তালে তালে শ্বেত কাশবনে।

১১

অনন্ত তোমার পিতঃ! মহিমা অপার
কত যে যতন ক'রে,
রাখিয়াছ ক্ষুদ্র নরে,
বিলাইছ অকাতরে সুখের ভাণ্ডার।

১২

প্রণমি তোমার পদে জগৎ-পাবন!
যে কদিন থাকে প্রাণ,
এই করো ভগবান্,
জীবনের নিত্য ব্রত করি সমাপন
সদা যেন হৃদে হেরি তব শ্রীচরণ।

শ্রীমতী মনোরমা রায়,
পুরুড়া।

বঙ্গ-মহিলা।

(প্রথম প্রস্তাব)

মানবের সকল উন্নতির মূল তাহার জ্ঞানোন্নতি। বঙ্গমহিলা সেই জ্ঞানলাভে বঞ্চিতা। সুতরাং বঙ্গমহিলার ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব জগতে অতি অল্পই আছে।

এই ভারতবর্ষে একদা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সাধ্বীগণ, খনা, লীলাবতী ভারতী* প্রভৃতি বিদুষীগণ এবং পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী, পান্না প্রভৃতি তেজস্বিনী, আত্মত্যাগিনী দেবীগণ বিরাজিতা ছিলেন। আজি সেই সকল মহীয়সী দেবীগণের মহিমা-মণ্ডিত, পদ-ধূলি-রঞ্জিত ভারতবর্ষে, তাঁহাদের জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া জ্ঞানহীনা, কর্ম্মে অসমর্থা, সর্ব্বতোভাবে অক্ষমা বঙ্গ-মহিলাগণ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই যে, বঙ্গ-মহিলাগণ জ্ঞানোপার্জ্জনে অশক্তা হইয়া

* ভারতী—পণ্ডিতবর মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী।

জন্ম গ্রহণ করে নাই। অন্যান্য সভ্য দেশের মহিলাদিগের মত, তাহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিও অনুশীলন দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে। তাহা না হইলে বর্ত্তমান কালে খ্রীষ্টান্ এবং ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় উচ্চ-উপাধি-প্রাপ্তা বঙ্গ-মহিলা দেশের মুখোজ্জ্বলকারিণী হইতেন না। হিন্দুসমাজেও রাণী ভবানী, দেবী ভগবতী, দেবী সোণামণি (১) এবং আজিকার সুলেখিকা সুকবি, সুগৃহিণী ও গ্রন্থরচয়িত্রী মহিলাগণও জন্মিতেন না। সেই জন্যই বলিতেছি, হায়! কেবল অনুশীলনের অভাবেই বঙ্গ-মহিলার জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইল না।

আজি কালি দেশের উন্নতির জন্য অনেক পুরুষই ব্যগ্র হইয়াছেন। সেই উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশবাসী জন-সাধারণের দেহের সুস্থতা, মনের জ্ঞান, চরিত্রের নির্ম্মলতা এবং ধর্ম্মে বিশুদ্ধ ভক্তি লাভপূর্ব্বক অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে নিজ নিজ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশে সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ভ্রান্ত। সেই ভ্রান্তি প্রযুক্তই তাঁহারা স্বদেশের উন্নতিকল্পে সহস্র প্রকার পরিশ্রম করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। উন্নতির যেটি প্রধান সহায় সেইটীতেই তাঁহাদের অমনোযোগ, অবহেলা; সুতরাং দেশের প্রকৃত উন্নতি, প্রতিকূল বায়ু-তাড়িত তরণীবৎ, গম্য পথে পরিচালন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, উন্নতির সেই প্রধান সহায়—বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা।

স্ত্রীজাতি পুরুষের নিত্য-সহচরী। স্ত্রী-লোকের সহায়তা ব্যতীত পুরুষের দিন চলে না। পুরুষ শৈশবে মাতৃহস্তে গঠিত, বাল্যে ভগিনীর সহিত ক্রীড়াসক্ত, যৌবনে ভার্য্যা লইয়া সংসারী, বার্দ্ধক্যে কন্যা, পুত্রবধূর শুশ্রূষায় নির্ভরশীল, এবং চির দিনই বাটীর গৃহিণীর সাহচর্য্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। যাঁহারা চিরকাল এইরূপ মনুষ্যত্বের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা বুদ্ধি ও বিচারশক্তিহীনা, মূর্খা, হীন-চরিত্রা এবং সর্ব্ববিধ মহৎ কর্ম্মের অযোগ্যা হইলে পুরুষের সুখ, শান্তি, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতি কোথায় রহিবে? ইহা যে আজিকার দিনে উল্লেখ করিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য্য।

প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সংসারে ও সমাজে যে কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা অনেকে বুঝিতেছেন, সন্দেহ নাই। এ দেশে এক প্রবাদ আছে যে, "রমণীই মানবের সকল অনিষ্টের মূল"। অনেক স্থলে যথার্থই দেখা যায় যে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি পারিবারিক অশান্তি রমণী কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা নারীচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, এ সকল দোষ রমণীর প্রকৃতির দোষ নহে—সহজাত সংস্কার নহে। ইহা

(১) দেবী সোণামণি—মাননীয় সারগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী।

রমণীর শিক্ষার অভাবে হইয়া থাকে। স্বার্থপরতা মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; কিন্তু স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইলেও ক্রোধ লোভাদি ছয় রিপু দমন করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, স্বার্থপরতাকেও দমন করা সেইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবের মনে মহত্ত্বাব সকল যত বিকাশ পাইতে থাকে, স্বার্থপরতা-জনিত নীচতা-সমূহ ততই দূর হইয়া যায়। ক্রমশঃ সুপ্রবৃত্তির অনুশীলনে মহত্ত্ব জন্মিয়া মানবকে পরার্থপর করে। সে অবস্থায় আত্মসুখ অবহেলা করিয়া সে পরের মঙ্গলার্থ আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়। নারী তখন "দেবী" হয়।

জ্ঞানানুশীলনে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত এবং চিন্তাশক্তি পরিস্ফুট হয়। মানব পরিণামদর্শী এবং হিতাহিত বিচার করিতে পারে। এই জ্ঞানানুশীলন পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের ও নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য সর্ব্বতত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" বলিয়া গিয়াছেন। এ দেশের প্রত্যেক গৃহস্থ, প্রত্যেক রমণীর অভিভাবক এবং প্রত্যেক সমাজের পরিচালক যে দিন বঙ্গমহিলার অজ্ঞানতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তন্নিবারণার্থ বদ্ধপরিকর হইবেন, সেই দিন বঙ্গমহিলার প্রধান অভাব বিদূরিত হইবে, দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে।

বর্ত্তমান কালে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছেন। আমাদের গবর্ণমেন্ট স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। আরও আনন্দের কথা এই যে, এ দেশের কতিপয় শিক্ষিতা মহিলা তাঁহাদের জাতীয় ভগিনীগণের অজ্ঞানতা দূর করিতে একান্ত যত্নবতী হইয়াছেন। এই সকল সদিচ্ছা হইতে এখন প্রায় প্রতি গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত, মিশনরী মহিলাগণ কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে অন্তঃপুর-শিক্ষার চেষ্টা, ঢাকায় বিধবাশ্রম, কলিকাতায় স্ত্রী-মহামণ্ডল প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইতেছে না। পল্লিগ্রাম-বাসিনী শত শত হিন্দু বালিকা ও রমণী বর্ণমালা মাত্র শিখিয়া অথবা নিরক্ষরা হইয়া দিন যাপন করিতেছেন। প্রকৃত-রূপে অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত ইহাঁদিগের অজ্ঞানতা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। কত মহাত্মা এবং মহাপ্রাণের আত্মোৎসর্গের ফলে যে ইহাঁদিগের জ্ঞানোন্নতি হইবে, ভবিষ্যৎ সে কথার উত্তর দিতে পারে।

লেখিকা—শ্রীমা।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম বাধ্যতা। ইহা শিশুদিগের বিদ্যা-শিক্ষার একান্ত উপযোগী। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় পিতা মাতা তাহার বাধ্যতা ভিন্ন কিরূপে তাহাকে শাসনে রাখিবেন? কিন্তু উহা পিতা মাতার হৃদয়ের প্রেম ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ হওয়া আবশ্যক। সেই কারণে শিশুকে এরূপে বশীভূত করিতে হইবে যে, অবাধ্যতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিবে না। ঐ সুকৌশল শিক্ষা দিবার জন্য ছেলের প্রতি যত আদেশ ও নিষেধ করা হয়, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উহার প্রতি অতিরিক্ত প্রভুত্ব দেখান হইবে না, সকল বিষয়ে নিজেদের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

পিতা মাতার ইচ্ছা ও আজ্ঞা সহজে শিশুর উপর কার্য্য করিতে যেন সক্ষম হয়। তাহা হইলেই সে প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত উহা পালন করিবে। তাহাকে যে আদেশ ও নিষেধ করিবে, তাহা স্পষ্টরূপে মন খুলিয়া তাহাকে বলিবে, তাহাকে মিষ্টকথাপ্রিয় করিবার আশায় অত্যন্ত মধুর কথা বলিয়া তাহার মন বিগড়াইয়া দিবে না। অন্য দিকে দেখা উচিত যে, শিশুর নিজের মন তোমার বিপক্ষে হইলেও, সে যেন তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিজের ইচ্ছাকে দমন করে। শিশুকে ঐরূপ বাধ্যতা শিখাইবার জন্য নিজের ইচ্ছামত অথবা যখন তখন তাহাকে আদেশ করিবে না, কেবল অতি আবশ্যক বিষয়েই তাহাকে আজ্ঞা ও নিষেধ করা উচিত। শিশুকে একটা কার্য্যে আদেশ দিয়া ক্ষণকাল পরে তাহাকে বিরত হইতে বলা অন্যায়। সকল বিষয়ে দৃঢ় হইতে হইবে। আর যদি কখন ছেলের আবদারে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার ইচ্ছামত কাজ করিতে দিতে বাধ্য হও, তাহা হইলে সে ভাবিবে তুমি নিজেই তাহাকে ঐ কাজটী করিতে বলিতেছ। শিশুকে তাহার পুষ্টিসাধনের উপযুক্ত যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। ক্রমাগত তাহাকে আজ্ঞা দিলে বা নিবারণ করিলে ছেলের মনে গোলমাল বাধে, সে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মত চলিতে অক্ষম হয়। অন্য দিকে শিশু উহাতে মনে করে যে, তুমি তাহার প্রতি অবিচার করিতেছ। আর অনেক সময় আদেশ ও নিষেধের কথা এক সঙ্গে বলাতে সে তাহার ক্ষুদ্র মনে কোন্‌টী উত্তম ও কোন্‌টী আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারে না। শিশুর মনে বিচার ও অবিচারের ধারণা এরূপ প্রবল যে, সে পিতামাতার কোন্ আজ্ঞাটী উচিত, কোন্‌টী অনুচিত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে ও অন্যায় আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে। সুতরাং যতক্ষণ ছেলে নিজের ইচ্ছামত চলিলে তাহার নিজের বা অন্যের কোন অপকারের সম্ভাবনা নাই,

ততক্ষণ তাহাকে বিরক্ত না করিয়া ইচ্ছামত খেলিতে ও চলিতে দেওয়া উচিত। অন্য দিকে তাহার মনে এই ধারণা থাকা উচিত যে, কোন কর্ম্ম করা তোমরা অন্যায় বিবেচনা করিলে সে হাজার আবদার করিলেও কখনও তাহা করিতে অনুমতি পাইবে না। শিশুর যে সকল দোষ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে, কিম্বা বড় হইলে যে সকল বিষয়ে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে শিখিবে, সে সকল বিষয় লইয়া তাহাকে জালাতন করা উচিত নহে। ইহার মধ্যে শিষ্টাচার একটী। বাল্যকাল হইতে শিশুকে নম্র ও ভক্তিমান্ হইতে শিখাইলে, পরজীবনে উহার ফলে তাহার শিষ্টাচার ও অমায়িকতা প্রকাশ পাইবে। ছেলেকে ছোট বড় সকলকে এরূপ সমান চক্ষে দেখিতে শিখাইবে যে; শিশু উহা স্বর্গীয় আজ্ঞার ন্যায় মানিবে। উহাকে ধনী ও নিঃসম্পত্তির প্রভেদ না শিখাইয়া নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কেবল প্রবীণ, বৃদ্ধ ও জ্ঞানী লোকদিগকে মান্য করিতে শিখাইবে। শিশুর সম্মুখে কখন ঝগড়া, পরনিন্দা বা তর্ক বিতর্ক করিবে না। কোন অশ্লীল ভাব বা বাক্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল আত্মাকে যেন মলিন না করে।

ভক্তির পুরস্কার।

এক নগরের প্রান্তভাগে একটী গভীর বন ছিল। সেই বনের মধ্যে একটী সাধু বাস করিতেন। সেই সাধুর সম্মুখভাগ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছিল। নদীটি কখন শুষ্ক হইত না, বর্ষা ঋতুর ন্যায় সমস্ত ঋতুতেই জলপূর্ণ থাকিত। তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে একটী সুগভীর হ্রদ ছিল। এই হ্রদের মধ্যে শরৎ ঋতুর ন্যায় অন্যান্য ঋতুতেও সুগন্ধ-যুক্ত পদ্মফুল সততই ফুটিয়া থাকিত। চারি দিকে যুঁই, জবা, বকুল, বেল ফুলের অভাব ছিল না। সেগুলি বসন্ত ঋতুর ন্যায় শীত, বর্ষা প্রভৃতি সকল ঋতুতেই বিকসিত হইত। সাধুর চারি দিকে কখন কখন হরিণশিশু এবং কখন বা ব্যাঘ্রশিশু খেলা করিত। সাধু ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। তিনি আপনার ভাবেই আপনি মগ্ন থাকিতেন। কাহারও প্রতি ফিরিয়া চাহিতেন না। শুধু নদীর শীতল বাতাস ও পদ্মাদি পুষ্পের সুগন্ধ তাঁহার আহারীয় ছিল। তিনি সময় সময় চক্ষু মিলিতেন বটে, কিন্তু বাহ্য বস্তু দেখিবার জন্য নহে, যাঁহার ধ্যানে তিনি ধ্যানস্থ ও সমাধিস্থ ছিলেন, শুধু তাঁহারই কীর্ত্তি দেখিবার জন্য। তাঁহার নিজের শরীর হইতে যে স্বর্গের বাতাস

বহিত, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার গুণেই যে তাঁহার আবাসভূমি স্বর্গতুল্য শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহাও তিনি জানিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি আপনার ভাবেই বিভোর। হঠাৎ এক দিন এক গোয়ালিনী কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন পূর্ণ মধ্যাহ্নকাল, রবির প্রখর উত্তাপে দিগ্‌দিগন্তর দগ্ধ প্রায় হইতেছিল। গোয়ালিনীর হাতে এক ঘটি দুধ ছিল। সে প্রথমে বনের বাহিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। বনের মধ্যে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে দেখিয়া সে তাহা আনিবার জন্য বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তখনও দুধের ঘটিটি ছিল। সে কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে সেই ক্ষুদ্র নদীর তীর দিয়া যাইতে লাগিল। সহসা দেখিল, একটী বিশাল বটবৃক্ষের নীচে একটি সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছেন। সন্ন্যাসীর শরীর এমন তেজোময় যে, দেখিলে বোধ হয় যেন ইহাতে কোন দিন কোনও ব্যাধি ছিল না। তাঁহার বদনমণ্ডল এমনই প্রফুল্ল যে, দেখিলে বোধ হয় তিনি চিরজীবনই সুখে কাটাইয়া আসিতেছেন। গোয়ালিনী ভক্তি-গদগদ-চিত্তে সন্ন্যাসীর দিকে ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র বদন বিস্তার করিয়া তাহাকে গিলিতে আসিতেছিল, সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। একটি সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, সে তাহাতেও ভীত হইল না। সন্ন্যাসীর চরণতলে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ব্যাঘ্র ও সর্প তাহাকে দংশন করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গোয়ালিনী দেখিল তাহার আর রক্ষা নাই। সে তখন "বাঁচাও বাবা" "বাচাও বাবা" বলিয়া সন্ন্যাসীর শরীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর কে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে? হিংস্র জন্তুরা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল। তাহারা যেন কতই অপ্রস্তুত, কতই লজ্জিত, কতই দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেল। গোয়ালিনী তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া আঁচল ভিজাইয়া নদী হইতে জল আনিয়া সন্ন্যাসীর চরণ ধৌত করিল। দুধের ঘটি তখনও সে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল। সেই ঘটি-ভরা দুধ সন্ন্যাসীকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসীও আনন্দে তাহার দুধ পান করিলেন। ঘটির দুধ শূন্য হইয়া গেলে সেই শূন্য পাত্র হস্তে গোয়ালিনী গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে হইলে একটী নদী পার হইয়া যাইতে হয়, কিন্তু সে নদীতে পার হইবার নৌকা ছিল না। নিজের নৌকায় অথবা অন্য কাহারও নৌকার সাহায্যে পার হইতে হইত। পর দিবস রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই গোয়ালিনী দুধের ঘটী হাতে করিয়া বাহির হইল। তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে সন্ন্যাসী বাবার নিকট যাইয়া আবার তাঁহাকে ঐ দুধ পান করাইয়া গাভীর দুধের এবং নিজের পরিশ্রমের সফলতা

করে। কিন্তু তখন নদী পার হইবার কোনও উপায় ছিল না। অত প্রত্যূষে সেখানে কাহারও নৌকা দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু সে যে নদীর ওপারে না যাইয়া থাকিতে পারে না। সাধুর পবিত্র মূর্ত্তি বার বার তাহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল। সে নদীর তীরে বসিয়া সন্ন্যাসীকে ভাবিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর নিকট যে সাপ ও বাঘ আছে তাহা সে ভুলিয়া গেল। যে পরম নিধি পায়, সে কি আর ঘরে থাকিতে পারে? গোয়ালিনী পাগল হইয়া উঠিল। নদীর মধ্যে যে জল আছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল। তাহার বোধ হইল যেন সম্মুখে শুষ্ক মাটী ও প্রশস্ত রাস্তা, সে তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া চলিতে লাগিল। যতদূর সম্ভব দ্রুতগতি হাঁটিয়া সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কত বাধা, কত বিঘ্ন তাহার গতিরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। গোয়ালিনী সন্ন্যাসী বাবাকে দুগ্ধ পান করাইয়া পরম প্রীতি-লাভ করিল। এই ভাবে দিনের পর দিন চলিল। গোয়ালিনী প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী বাবাকে দুগ্ধ পান করায়। কিছুকাল পরে তাহার আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইল না। কারণ সে একদিন গৃহে ফিরিবার সময় সেই বনের মধ্যেই তাহার গাভীকে দেখিতে পাইল। সে গাভীকে লইয়া সেই বনের মধ্যেই বাস করিতে লাগিল। সাপ ও বাঘ যে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকও রহিল না। সে এখন দুই বেলা গাভীকে দোহন করিয়া সন্ন্যাসীকে দুগ্ধ পান করায় ও নিজেও কিছু কিছু পান করে এবং বসিয়া বসিয়া মনের আনন্দে সন্ন্যাসীকে দর্শন করে। সে আর গৃহে ফিরিয়া যায় না; গৃহে তাহার স্বামী, পুত্র, কন্যা সকলেই ছিল। প্রথম প্রথম তাহার মন তাহাদের জন্য ব্যথিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে সে ব্যথা কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম ক্ষুৎপিপাসা তাহাকে কাতর করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে তাহার কাতরতা হ্রাস পাইতে লাগিল। আহা! ভগবান্ যাহার প্রতি কৃপা করেন, তাহার মুক্তি এই ভাবেই হইয়া থাকে, এবং যে যাঁহাকে ভক্তি করে, সে তাঁহার নিকট হইতেই উপকৃত হয়।

চোখের ভাষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

পরদিন প্রভাতকালে লাবণ্যবালার অন্তঃকরণ এক প্রকার অব্যক্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রৌদ্র আজ

তেমনি প্রখরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বাতাস তেমনি উত্তপ্ত হইয়াছিল, পাখীরা তেমনি করিয়া কলরব করিতেছিল। কিন্তু লাবণ্যের নিকট আজ সবই নূতন, সবই অভিনব। প্রখর রৌদ্র আজ তাহাকে চরিতার্থ করিল, পক্ষিগণ আজ তাহার কর্ণে সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, এমন কি উত্তপ্ত বায়ুও আজ তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিল না। তুচ্ছ বিরক্তিকর দৈনিক গৃহকার্য্যও আজ তাহাকে সন্তোষ দিতে লাগিল।

নিবিষ্টমনে সে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, এমন সময় যতীন ব্যস্ত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া রূঢ়ভাবে বলিল, "লাবণ্য, এ কি শুনছি? সত্যই কি তুমি তোমাকে বিক্রয় করেছ?"

সহসা বজ্রপাতে লোকে যেমন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়, লাবণ্য তেমনি স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সত্যই কি সে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছে? সত্যই সে কি অর্থের লোভে আপনার দেহ যোগেশ বাবুকে বিক্রয় করিয়াছে? আপনাদের বংশের মানমর্য্যাদা ও আত্মসম্মান তুচ্ছ করিয়া সত্যই কি সে পিতৃশত্রু যোগেশ বাবুকে বরণ করিয়াছে?

হায়! কে এখন তাহাকে বিশ্বাস করিবে? কে বিশ্বাস করিবে, যোগেশ বাবু তাহাকে ভালবাসেন? কে বিশ্বাস করিবে যে, যোগেশ বাবু তাহারই জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত? কেই বা বিশ্বাস করিবে, অর্থের আকর্ষণে নয়, প্রেমের আহ্বানেই সে যোগেশ বাবুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে?

সহসা সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। সর্পদষ্ট পথিকের মত মর্ম্মাহত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। যতীন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "লাবণ্য, তুমি শেষে টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না? কেবল পিসিমার দোষ নয়। ছিঃ ছিঃ, তুমি কি জান না, যোগেশ বাবুই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে? লোকেই বা কি বল্বে?"

লাবণ্য অস্পষ্ট ভাবে বলিল, "দাদা আমি ত টাকার লোভে—"

"থাক্, আর মিথ্যা কথার আবশ্যক নাই।"

ভীত, শঙ্কিত, অপমানিত বালিকার ভ্রাতার সেই রূঢ় বাক্যের প্রত্যুত্তর দিবার সামর্থ্য রহিল না। স্নেহময় ভ্রাতার কঠিন ভর্ৎসনা সে কখন শুনে নাই। তাহার দুঃখ, শোক, অভিমান উথলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "দাদা, তুমিও আমাকে বিশ্বাস কর্বে না? তোমাকে সত্য বল্ছি, টাকার লোভে আমি সম্মত হই নাই।"

ঘাড় নাড়িয়া যতীন বলিল, "না, লাবণ্য! এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তুমি মিথ্যা ব'লে আর তোমার পাপের মাত্রা বাড়াইও না।"

লাবণ্য আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল তাহার

গণ্ড-যুগল প্লাবিত করিয়া ঝর্ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কক্ষ ত্যাগ করিয়া সে চলিয়া গেল।

যতীন সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। কিরূপে এ বিবাহ বন্ধ করিয়া তাহার ভগ্নীকে লোক-নিন্দা হইতে মুক্ত করিবে, ইহাই সে ভাবিতে লাগিল। সে মনে মনে সংকল্প করিল, যে কোন উপায়ে যোগেশ বাবুকে তাড়াইতে হইবে।

অপরাহ্নে যতীন বাহির হইল না। ঘরে বসিয়া কি করিবে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় বাহিরে শব্দ হইল। উঠিয়া দেখেন যোগেশ বাবু আসিয়াছেন।

যোগেশ বাবু জানিতেন যতীন তাঁহার উপর বড় সদয় নয়। কিন্তু কল্যকার ঘটনায় তাঁহার আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কাল যখন তিনি ভগ্নীকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার আশা হইল ভ্রাতাকেও জয় করা এবার আর কঠিন হইবে না।

হাসিয়া যোগেশ বাবু বলিলেন, "কি যতীন বাবু, কেমন আছেন?" রুক্ষ-গভীর-কণ্ঠে যতীন উত্তর করিল, "বসুন।"

কিন্তু যোগেশ বাবু এমনি আনন্দে মাতিয়াছিলেন যে, যতীনের গাম্ভীর্য্যের তাৎপর্য্য তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "লাবণ্য আপনাকে সব বলিয়াছে বোধ হয়। আমি আশাতীত সুখ লাভ করিয়াছি। আমি একেবারে হতাশ হইয়াছিলাম।"

বজ্র-কঠিন-কণ্ঠে যতীন বলিল, "যোগেশ বাবু, বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আপনার বিশ্বাস লাবণ্য আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে আপনার ক্ষমা করিতে হইবে।"

অবাক হইয়া যোগেশ বাবু বলিলেন, "যতীন বাবু, আপনি কি পাগল হইয়াছেন? লাবণ্য কোথায়?"

"লাবণ্যকে ছাড়িয়া দিন্। আমি তাহার হইয়া আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। যদি আপনি লাবণ্যকে ভালবাসেন, তবে তাহাকে মুক্তি দিন।"

"কি বল্‌ছেন যতীন বাবু, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আপনি কি বুঝিতে পারিলেন না যে সে আপনাকে ভালবাসে না, কেবল টাকার লোভে আপনাকে আপনার নিকট বিক্রয় করিয়াছে? সত্য বলিতে কি, সে আপনাকে ঘৃণা করে।"

"কি? আপনি ঠিক্ বলিতেছেন?"

"আপনাকে প্রতারণা করিবার আমার কোন আবশ্যক নাই। টাকার লোভেই লাবণ্য আপনাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।"

ভগ্ন কণ্ঠে যোগেশ বাবু কহিলেন, "তবে তাহাই হউক। আমি তাহাকে মুক্তি দিলাম।"

"লাবণ্যকে ডাকিতেছি? তাহার মুখেই আপনি শুনিবেন।"

না। তাহাকে ডাকিবার আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি সুন্দরবনেই যাইব। মূর্খ আমি—তাই ভাবিয়া-

ছিলাম সে আমাকে ভালবাসে। যাক্, বিদেশে গিয়া তাহাকে ভুলিতে পারিব বোধ হয়।"

সহসা সশব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। অশ্রুসিক্তা বিবশা লাবণ্য সঙ্কোচ, বাধা, লজ্জা, সরম ভুলিয়া গিয়া যোগেশ বাবুর নিকটস্থ হইল।

সৈনিক তাহার ছিন্ন পতাকা পুনরুদ্ধার করিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে শত্রুর সম্মুখীন হয়, যোগেশ বাবু হাতে প্রিয়াকে ফিরাইয়া পাইয়া সেইরূপ গর্ব্বিতভাবে যতীনের দিকে অগ্রসর হইল।

যতীন স্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। শেষে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "লাবণ্য, সত্যই তুমি যোগেশ বাবুকে ভালবাস?"

লাবণ্য তাহার সেই নিরীহ, বিস্ফারিত সজল চক্ষু দুটী তুলিয়া একবার দেখিল। যতীন এবার আর লাবণ্যকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। কথায় অবিশ্বাস করা যায়, কিন্তু চক্ষুর ভাষার সহিত প্রতারণা চলে না।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

প্রকৃত জীবন।

মানুষ যতদিন জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম না হয়, ততদিন সে অজ্ঞ থাকে, ততদিন তাহার জীবনের বিকাশ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা করিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, কিম্বা রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, এবং জ্ঞানী না হইলে "প্রকৃত জীবন লাভ করা যায় না। জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত জীবন কিরূপে লাভ করা যায় এ বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। জ্ঞান অর্থে ভাল করিয়া জানা। যে বিষয় আমরা ভাল করিয়া জানিয়াছি, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, আয়ত্ত করিয়াছি, সেই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হইয়াছে। জ্ঞানের অর্থ এই। এখন "প্রকৃত জীবন" লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? শুধু কি যে কোন একটা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলেই জীবন লাভ হইবে? তাহা হইতে পারে না। প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে সকল প্রকার জ্ঞানের আবশ্যক। সাংসারিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা যায় এবং পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতি পরিজনদিগের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য

নির্দ্ধারিত হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারা নিজ জীবনকে সকল প্রকার সদ্‌গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া আত্মাকে প্রকৃতরূপে জানা যায় এবং পারমার্থিক জ্ঞান দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ও ভোগ-সুখ-লালসা হইতে বীতস্পৃহ হইয়া পরমাত্মাকে হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই ত্রিবিধ জ্ঞানে ভূষিত হইতে পারিলেই মানুষ প্রকৃত জীবন লাভ করে। বিদ্যালাভ করিয়া যদি কাহারও কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্যক্‌রূপে না জন্মে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইয়া যদি কেহ অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া ও অহঙ্কার বিনাশ না করিয়া স্বার্থের দাস হয়, উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে যদি বিনয়, নম্রতা ও ধীরতা না আসে, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে সে বিদ্যা, সে ধন বা সে শিক্ষার কোন ফল নাই।

প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে বিদ্বান্ হইতে হইবে, নম্র, বিনয়ী ও ধীর হইতে হইবে, পরোপকারী, উদার-হৃদয় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ধার্ম্মিক হইতে হইবে। এই সকল গুণে মানুষ যদি পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেবতা হইবেন ও পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। ধর্ম্ম দ্বারাই মানুষ এই উচ্চ পদ লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধর্ম্মই মানুষকে "প্রকৃত জীবন" দান করিতে পারে, আর কিছুতেই পারে না। ভক্ত সাধুগণের জীবনের অনুকরণ করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এ বিষয়ে নর-নারীর সমান অধিকার। বরং নারীরই ইহা প্রধান কর্ত্তব্য। যে গৃহের জননী বা ভগিনীগণ ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্ত, উদার-হৃদয়া, দয়াবতী, পরোপকারিণী ও বিদ্যা-জ্ঞানমণ্ডিতা হন, সে গৃহের সন্তানগণ অবশ্যই আপনা হইতে সেই সকল গুণের অধিকারী হইবে এবং তাঁহাদের আদর্শ জীবনের ছায়া পরিবারের প্রত্যেকের উপর পড়িবেই পড়িবে এবং তদ্দ্বারা সংসার ও সমাজ ধন্য হইবে। তাই প্রার্থনা করি, আমাদের ভারতের প্রত্যেক গৃহ এইরূপ জ্ঞানধর্ম্মমণ্ডিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করুক, রমণী হৃদয়কে আরও সুন্দর করুক, তাহাদের গৃহ ও সংসারকে স্বর্গের শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ করুক। এখানে আসিয়া যেন মানুষের প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ইংরাজীতে একটী গান আছে—

Home, Home, sweet Home.
There is no place like Home.

এইরূপে গৃহবাসী সকলে নিজগৃহে যেন অনন্ত সুখের আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হন। "প্রকৃত জীবনের" ইহাই পরিচয়। যে নিজে সুখী, গৃহবাসী সকলেই তাহা দ্বারা সুখী হয়। জনসমাজ ও দেশবাসী তাহার জীবনের সংস্পর্শে ধন্য হয়।

—

আদর্শ রমণী স্বর্গগতা শ্রীমতী নীলমণি দত্ত চৌধুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমৃদ্ধির ক্রোড় হইতে মানুষ যখন অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার সকল বিষয়েই একটা অস্ফুট অভাব অনুভূত হয় এবং সে অভাব পূরণ না হইলে মনকে অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া তুলে। এ ক্ষেত্রে নব-পরিণীতা বধূর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিল। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার প্রকৃতি এমন সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, তিনি যখন যে অবস্থায় পড়িতেন, তখনই সেই অবস্থায় আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতেন। কাজেই স্বামিগৃহে আত্মীয়বর্গের নিকট শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পারিবারিক কার্য্যে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। অবশ্য তাঁহার শ্বশ্রুমাতা তখন বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলা তখনকার দিনে কিছু প্রীতিকর কার্য্য ছিল না। কিন্তু তিনি নিঃশব্দে সকল সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার এমন সহায়তা করিতেন যে, তাঁহাকে কোন কাজে অপ্রস্তুত করা দূরে থাকুক, সকলেই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। পারিবারিক জীবনে এমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার শ্বশুরকুলে আত্মীয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু আজীবন এরূপ সমভাবে তাঁহাদিগের সকলকার পরিচর্য্যা করিতে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। বড় মানুষের ঘর হইতে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যে আসিয়া পড়িলে সকলেরই মনের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা আসিয়া পড়ে। কিন্তু, তিনি এতই অহমিকাশূন্য ছিলেন যে, সে দোষ তাঁহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই।

কুমারী-জীবনে পিতৃগৃহে সাংসারিক কার্য্য তাঁহাকে কিছুই দেখিতে হইত না। তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, তিনি রন্ধনকার্য্য পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে রন্ধন শিখিতে হইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে সকল স্থানেই গৃহস্থের বধূ ও কন্যারা আজও পর্য্যন্ত রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। স্বামিগৃহে আসিয়া তাঁহাকেও রন্ধনকার্য্যে সহায়তা করিতে হইল। একবার তাঁহার এক প্রাপ্তবয়স্কা ননদিনী সাংসারিক অন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে শীঘ্র কোন একটি রান্না রাঁধিতে বলিলেন। তিনি তখন সদ্যপরিণীতা কুলবধূ, রন্ধন কার্য্যের কিছুই জানিতেন না। কাজেই তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন, "জানি না" বলিলে তখনকার দিনে সকলেই নিন্দা করিবেন। সৌভাগ্যের বিষয়,

তখন তাঁহার স্বামীগৃহে ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা রাঁধিবার সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া ননদিনীর আদেশ পালন করিলেন। অবশ্য ভোজনসময়ে তাহা যে খুব উপাদেয় হইয়াছিল, এমন কথা বলি না, কিন্তু, এই অপারদর্শিতাই ভবিষ্যতে তাঁহাকে রন্ধনবিদ্যায় একজন বিশিষ্ট শিল্পী করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরাজী ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। এই সময়ে তাঁহার স্বামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। সেথানে কয়েক মাস অবস্থিতির পর তিনি মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কিছু দিনের মধ্যেই মালদহে সরকারী উকীলের পদ শূন্য হইল। ইহাতে প্রিয়নাথ বাবুর আবেদন গ্রাহ্য হইল। তিনি মালদহে সরকারী উকীল হইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই সেথানে যশস্বী হইয়া উঠিলেন। যে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই জয়লাভ হইতে লাগিল ও রাশি রাশি অর্থ নানাদিক হইতে আসিতে লাগিল। এই-রূপে একলা সমস্ত দিক লক্ষ্য করিয়া চলা কিছু কষ্টকর ভাবিয়া তিনি ১৮৭৩ সালের গুডফ্রাইডের ছুটীতে পত্নীকে কাছে লইয়া আসিলেন। নিতান্ত বালিকা হইলেও পূর্ব্ব হইতে স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। স্বামীর নিকট যাইবার জন্য কত অনুযোগ করিতেন, কিন্তু পাছে একলা থাকিয়া কষ্ট অনুভব করেন, এ কারণে প্রিয়নাথ বাবু সহজে তাহাতে সম্মত হইতেন না। শেষে যখন আসিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন, তখন উত্তরে এই মর্ম্মে পত্র আসিল যে "যদি সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ নারীগণ রাজকন্যা হইয়াও সুখ ও সমৃদ্ধির ক্রোড় হইতে উঠিয়া স্বামীর সহিত বনগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সামান্য নারী হইয়া তোমার সহিত থাকিয়া যদি কষ্টও অনুভব করিতে হয়, তাহাও সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিব। নারীর স্বামীই স্বর্গ, স্বামীই সুখ, স্বামীই সর্ব্বস্ব।" এ কথার মূল্য কত অধিক তাহা কেবল এ দেশের লোকেরাই ধারণা করিতে সক্ষম। ইতিহাসে নানা স্থানে নানা জাতির কথা দেখি, কিন্তু কই ভারতের মত এমন আদর্শ স্ত্রীচরিত্র প্রায় দৃষ্টিপথে পড়ে না। যাহা হউক, মালদহে স্বামীর যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, সমস্তই স্ত্রীর হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু হিসাব কে রাখে? বালিশের নীচে, ভাঁড়ার ঘরে হাঁড়ির ভিতর সেই সমস্ত টাকা কড়ি রক্ষিত হইত। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, তাঁহার রাখিবার আধারের অভাব ছিল না, কিন্তু, সরলপ্রকৃতি নীলমণি পৃথিবীর কূটচক্র কিছুই বুঝিতেন না, সকলকেই আপনার মত দেখিতেন, কাজেই তাঁহার নিকট কেহই অবিশ্বাসের পাত্র ছিলেন না। সেথানে পাড়াপড়সী

দুই এক ঘর দুঃস্থ পরিবারের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের জন্যও তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। সকল লোকেই তাঁহাকে মার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।

কিন্তু, এমন সুখের সংসার পাতিয়াও মালদহে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। দুই তিন বৎসর সে স্থানে অবস্থানের পর উভয়েরই স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিল। বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে কিছু দিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নাগপুর যাত্রা করিলেন। সেথানে স্বাস্থ্যোন্নতি যথেষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকালতী করিয়া পসার প্রতিপত্তি স্থাপন করাও সহজসাধ্য মনে হইল। কাজেই আবার দীর্ঘাবকাশ গ্রহণ করিয়া প্রিয়নাথ বাবু নাগপুরে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। সেথানেও অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার স্ত্রীর কিছু কষ্ট হইত। কতকটা আহার্য্য দ্রব্যের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন এবং কতকটা দাসদাসীর ভাষা দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় শীঘ্রই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল, কিন্তু সে কষ্ট অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প কালের মধ্যেই সকল বিষয়েই তিনি সেথানকার লোক হইয়া পড়িলেন। আহারের কষ্টও এক রকম স্বাস্থ্যের খাতিরে মানাইয়া লইলেন এবং স্থানীয় ভাষাও বলিতে ও বুঝিতে শিখিলেন। লোকের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে এই ভাষাই তাঁহার প্রধান সহায় হইল। কাহার হৃদয়ে কি ব্যথা আছে, কি করিয়া তাহার উপশম হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি কাহারও উপর কোন আদেশ করিতে জানিতেন না, মিষ্ট কথায় জগৎ তুষ্ট, এই মহানীতির অনুসরণ করিয়া সকলকেই তিনি মিষ্ট কথায় বশ করিতেন। এজন্য লোকেও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। নাগপুরে বহুদিন অবস্থিতির জন্য কয়েকটি ইউরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশীয় মহিলার সহিত নীলমণি পরিচিতা হয়েন। ক্রমশঃ এই সমস্ত পরিবারে তাঁহার এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যে, কিছুদিন তাঁহারা যদি তাঁহাদের বন্ধুটীকে না দেখিতে পাইতেন ত ছুটিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং তাঁহার ওই বিদেশিনী বন্ধুদিগের মনে তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার ও প্রকৃতিমধুর স্বভাব দেখিয়া এমনই একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, হিন্দুরমণী মাত্রেই তাঁহাদের বন্ধুর ন্যায় সরলপ্রকৃতি। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত না হইলেও তাঁহাদিগেরই সরলতার পরিচায়ক। এ স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংরাজীতে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি সাধারণতঃ হিন্দী ও মারহাট্টি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ নিত্যই খাদ্যদ্রব্যাদির আদান প্রদান হইত। অনেকেই বিদেশীয়দিগের সহিত মেশামেশিতে তাঁহার উপর ভ্রুকুটি

করিতেন। কিন্তু, তাহাতে তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। সকল দেশে ও সকল কালে উদার হৃদয়ের ব্যবস্থাই এইরূপ, তবে তাহাতে তিনি কেন ক্ষুণ্ণ হইবেন?

পরসেবায় তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। সংসারে চাকরের বাহুল্য সত্ত্বেও প্রায় সকল কাজই তিনি নিজে দেখিতেন। পরিশ্রমে তিনি কখনও কাতর হইতেন না। দিনে হউক, রাত্রিতে হউক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক বা অধিক হউক, গৃহে পরিজনবর্গের সেবার্থেই হউক, বা অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যার্থেই হউক, তিনি কখনও সেবাতে বিমুখ ছিলেন না। তাঁহার দৈনিক জীবন হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, অতি প্রত্যুষেই তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, এবং স্নানান্তে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া পাচিকার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং সেখানে সকলকে ভোজন করাইয়া বেলা ২টার সময় নিজে আহার করিতেন, তারপর কয়েক ঘণ্টা নামমাত্র বিশ্রামের সময় হইত। তখনও তিনি সংসারের হিসাব দেখিতে কিম্বা সেলাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সময়ে কখনও কখনও ছোট ছেলেমেয়েদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিতে ও নীতিপূর্ণ ভাল ভাল কবিতা মুখস্থ করাইতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে। বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎও সেই অবসরের মধ্যেই হইত। মনুষ্যের জাগ্রত অবস্থাই জীবন, তাহা ছাড়া আর যাহা কিছু সকলই মৃত্যুর ঘনীভূত ছায়ামাত্র, এ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। সেইজন্য তিনি বিশ্রামের কথা আদৌ মুখে আনিতেন না। সে যাহা হউক, এ দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন হইলে বেলা ৫টার সময় আবার পরিজনবর্গের আহারাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হইতেন। শেষে সকলকে ভোজন করাইয়া রাত্রি ১টার সময় বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিতেন। তিনি সারাদিন খাটিয়া সারা হইতেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে "শ্রান্তি বোধ করিতেছি", এ কথা বলিতে শুনি নাই। আত্মীয়-ভোজন প্রভৃতি বাড়ীর কোন বৃহৎ ব্যাপারেও তাঁহাকে অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার সে উদ্যম, সে উৎসাহ দেখিলে তাঁহার পরার্থপরতাকেই ধন্য ধন্য করিতে হয়। আত্মীয়বর্গ বা বন্ধুদিগের গৃহে কোন কার্য্যে তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইলে সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু একবার তিনি তথায় উপস্থিত হইলেই শত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যেন মন্ত্রবলে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইত, ইহাই তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরসেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বন্ধুদিগের বাড়ীতে রোগশয্যায় শায়িত কাহাকেও দেখিলে কিম্বা কেহ প্রসববেদনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে শুনিলে তিনি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে যাইতেন। নিজের সংসার তখন কোথায় ভাসিয়া যাইত। এ কার্য্যে

তাঁহার এমনই একাগ্রতা ছিল যে, তিনি একেবারে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া শুশ্রূষা দ্বারা রোগীকে সুস্থ করিয়া তবে গৃহে ফিরিতেন। এইরূপ সেবায় তাঁহাকে উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন কাটাইতে দেখা গিয়াছে। রোগী রোগশয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু তিনি নিকটে গেলেই একেবারে শান্ত। মধুরপ্রকৃতি শান্ত-স্বভাবা নীলমণি বাস্তবিকই রমণীশ্রেষ্ঠ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সহিত তুলনায় এ ক্ষেত্রে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি যে কেবল আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের সেবায় অপার আনন্দ অনুভব করিতেন, এমন নহে, অপরিচিত লোক, ইতর জন্তু, পশুপক্ষী, গোবৎসাদি সকলকেই তাঁহার কৃপাকণা বিতরণ করিতেন। নাগপুরে টাঙ্গাগাড়ীতে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে বয়েল (বলদ) জোতা প্রশস্ত। তাঁহারও এক জোড়া বয়েল ছিল। স্বামী ও পুত্রকে সকালে আদালত ও স্কুলে পঁহুছাইয়া আসিলে তিনি "আহা, বয়েল বড় খাটিয়াছে" বলিয়া তাহাদিগকে খড় খাইতে দিয়া শ্রমাপনোদন জন্য তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন। অধিক দিনের কথা নহে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে যখন তাঁহার গাড়ী ও ঘোড়া পাঠান হইল, তখন বয়েল রাখা অনাবশ্যক বিবেচনায় ছেলেরা উহা-দিগকে বিক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি এমনই দয়ার্দ্রচিত্তা ছিলেন যে, কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। শেষে যখন তাঁহার মত লইয়া উহা বিক্রয় করা হইল, তখন তিনি মনের আবেগে এতই অধীর হইয়া উঠিলেন যে, কোন মতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। নাগপুরে একবার তাঁহার বাড়ীতে সেখানকার এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া প্রভূত-ধনশালিনী রমণী ভাড়াটিয়া ছিলেন। তাঁহার অভিভাবকের মধ্যে কেহ কোথাও ছিল না। এক দিন তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, আমার হঠাৎ অসুখ হইলে কে আমাকে দেখিবে ? তাহাতে নীলমণি অম্লানবদনে বলিলেন, "যখন আমি আছি, তখন তোমার ভাবনা কি ? আবশ্যক হইলেই আমি ছুটিয়া আসিব।" নারীহৃদয় স্বভাবতঃই কোমল, কিন্তু এ পুণ্যবতীর হৃদয় যে কি উপাদানে গঠিত, তাহা স্থির করা সুকঠিন। পরকে ভালবাসিবেন, নিজ হৃদয়ের স্বর্গীয় সুগন্ধ অপরকে বিলাইয়া আত্মতুষ্টি করিবেন, ইহাই তাঁহার চরিত্রের মহত্ব।

নারীর পতিই স্বর্গ, পতিই একমাত্র গতি, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে চিরকাল বদ্ধমূল ছিল। স্বামীর কি অভাব, স্বামীর আহার হইল কি না, স্বামী বিমর্ষ কেন, এ সমস্ত তিনি প্রকৃত দার্শনিকের মত দেখিতেন ও তাহার প্রতিকারে সর্ব্বদা যত্নবতী হইতেন। সংসারে শতকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ছুটিয়া আসিয়া সর্ব্বদা স্বামীর তত্ত্ব লইতেন। বস্তুতঃ এতাদৃশী পতিপ্রাণা রমণী যাঁহার সংসারে বিরাজ করেন, তাঁহার সংসার প্রকৃতই স্বর্গ। ইদানীং

তাঁহার স্বামীর স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীর গুণে ও সেবায় কচিৎ তাঁহাকে শয্যাগত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রকৃত ভালবাসার বিনিময় জগতে নিতান্ত বিরল হইলেও হিন্দুর নিকট উহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে! স্ত্রী যেমন স্বামীকে দেখিয়া "তুহুঁ তুহুঁ" (তুমি তুমি) করিতেন, স্বামীও তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। প্রতিদান না থাকিলে ভালবাসায় মাধুর্য্য থাকে না, দুইটি হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত অনুক্ষণ অনুভূত হইত বলিয়াই তাঁহাদিগের পরস্পরের ভালবাসা অতুলনীয় ছিল।

তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, তাহা বৈরাগ্য। বেশবিন্যাসাদির প্রতি তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না; ভোজ, আমোদ বা নিমন্ত্রণে পারতপক্ষে তিনি যাইতে চাহিতেন না। যদি কখন অনুরোধ উপরোধে যাইতে সম্মত হইতেন, সামান্য পোষাকেই যাইতেন। আহারাদির বিষয়েও ঐরূপ নিয়ম লক্ষিত হইত। তিনি বলিতেন, "মাটীর দেহ, মাটীতে মিশাবে, তবে তাহার জন্য কি যত্ন করিব?"

পরিচিত বন্ধুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার উদার মত অনেকেরই জানা ছিল। নিজে হিন্দু হইলেও তিনি অপর ধর্ম্মের কখনও নিন্দাবাদ বা বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। আচারসম্মত আহ্নিক পূজাদি করা কিছুই তাঁহার ছিল না। এজন্য তাঁহাকে আত্মীয়াদিগের নিকট হইতে কটূক্তিও শুনিতে হইয়াছে, কিন্তু যখনই এ বিষয়ে কথা উঠিত, তখনই তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতেন, গৃহে যাহার পতিদেবতা বর্ত্তমান, তাহার আবার অন্য দেবার্চ্চনা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। গুরু করণ বা মন্ত্র লইবার কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, "স্বামী আমার পরমগুরু, তাঁহার নিকট বালিকা-বয়স হইতে যে শিক্ষা ও দীক্ষায় পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাহা অন্য কাহারও নিকট হওয়া সম্ভব নহে।" কখনও কখনও তাঁহার প্রৌঢ়া আত্মীয়াদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে তীর্থযাত্রায় প্রণোদিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার মনের এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, "সর্ব্বমিদং ব্রহ্মময়ং জগৎ", তবে আর তীর্থযাত্রায় ফল কি? ঘরে বসিয়া স্বামি সেবায় ব্রত বা তীর্থযাত্রার ফল লাভ করিতে ত পারি, তবে আর সুদূর প্রবাসে যাইবার আবশ্যকতা কি? হিন্দুর গৃহে যে রমণী প্রৌঢ়াগণের সমক্ষে এই কথা বলিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মমত কতদূর উদার ও উন্নত তাহা সহজে বুঝা যায়।

শেষ জীবনে তাঁহার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভগ্ন হইয়াছিল। ঐ ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই তিনি সমস্ত কার্য্য দেখিতেন। পরিশেষে গত ১২ই মার্চ্চ তিনি পাণ্ডুরোগে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ভিষগ্‌বর্গের চেষ্টার কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু হায়! ভাঙ্গা ঘরে বন্যা আসিলে তাহার

গতিরোধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ক্রমে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল এবং তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজী ১৯১২ সালের ১৫ই মার্চ্চ, বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২রা চৈত্র, শুক্রবার, তাঁহার অমর আত্মা তামস রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মর্ত্তধাম পশ্চাতে রাখিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইলেন।

"এক বিন্দু প্রাণ অনন্তের সনে মিশিয়া
লভিল অনন্ত প্রাণ,
বাজিল স্বরগে বিজয়দুন্দুভি, গাহিল
দেবতা-বিজয়গান!"

অসময়ে তাঁহার অমূল্য জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু যে শোকাগ্নি তিনি স্বামী ও পুত্রকন্যার হৃদয়ে জ্বালিয়া গেলেন, তাহা চিরকালই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিবে। বড় দুঃখেই অন্ধ কবি গাহিয়াছিলেন,

"সাঙ্গ না হইল হায় জীবনের ব্রত,
ডুবিল দেহের তরি ফুরাল সকলি!"

এখন তাঁহার অমর আত্মা স্বর্গে চির-শান্তি লাভ করুক, এই আমাদিগের করুণ প্রার্থনা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, বি, এ,
৩ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উন্মত্তের প্রলাপ।

(আবৃত্তি)

কোন স্থানে জনৈক সহজজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ দুরদৃষ্টবশতঃ এক সময়ে বাতুলাশ্রমে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহারই আক্ষেপোক্তি।

স্থান—কারাগার। কাল—প্রাতঃ।

(কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

উন্মত্ত পুরুষ।—

কারাধ্যক্ষ—কারাধ্যক্ষ,
আমিত বাতুল নই—
কেন মোরে রেখেছ ঘেরিয়া,
কেন মোর এতেক যন্ত্রণা?
পলে পলে শুষিছে শোণিত,
কি উত্তাপ হৃদয়কন্দরে—
কি চিন্তা মস্তকে মোর—
কেমনে বুঝাব আমি!
যাচি যুক্তকরে—
ছেড়ে দাও,
চলে যাব দূরদূরান্তরে,
নরে না দেখাব মুখ।

* * *

কারাধ্যক্ষ!
আমি কি পাগল?
কে বলে উন্মত্ত মোরে?
শত্রু তারা—পশু তারা—
ঘৃণ্য নীচ স্বার্থের সেবক,
কহে মোরে বিকৃতমস্তক!
সুস্থ আমি—স্থির আমি—
আমি অচঞ্চল,

স্মৃতি মোর অম্লান উজ্জ্বল,
তবে কেন বল মোরে—পাগল!
পাগল!

* * *

কি ভীষণ কারাবাস,
অদৃষ্টের,তীব্র উপহাস!
মৃত্যু যে বরং শ্রেয়ঃ!
কি কষ্ট এ কঠোর পরাণে,
কি দারুণ যাতনা জীবনে—
অহরহ সহি নিরজনে—
কেমনে তা বুঝাব তোমায়!
কারাধ্যক্ষ—কারাধ্যক্ষ,
মেরে ফেল তুমি—
দাও হৃদে হানি তরবার,
যাতনার হোক অবসান।

* * *

শুন ওই অশরীরী বাণী,
হের ওই উষার বিকাশ,
কি মধুর—শান্ত স্নিগ্ধ পূরব
আকাশ!
মরি মরি,
কি সুন্দর ফুল,
কিবা গন্ধ মনোহর—আবেশে
আকুল,
ছোটে অলি, মলয়ার বায়,
কূজনে কোকিল,
পাপিয়ার তানে স্তব্ধ বিশ্ব—
স্তব্ধ চরাচর!

* * *

একটী সুন্দর মুখ ভাসে মোর মানস-
নয়নে—
আনে স্মৃতি দূর এক অতীতের ছবি।
এমনই সুন্দর এক বসন্তপ্রভাতে,
প্রিয়া মোর বুকে রাখি শির,
বলেছিল ধরি দুটী কর—
জীবনে মরণে রব বাঁধা পরস্পর!
অহো! অকৃতজ্ঞ আমি—
গেছে সেত স্বরগে হাসিয়া,
আমি হেথা ক্ষিপ্ত, ক্লিষ্ট, পতিত, দুর্ব্বল,
ঊর্দ্ধ নেত্রে চেয়ে আছি আবেগে বিহ্বল।

* * *

ছিঃ ছিঃ—আবার সে স্মৃতি—
দূর হোক অতীতের করুণ কাহিনী,
নিভে যাক্ পুরাতন হাসি!
কারাধ্যক্ষ!
এই সব দুশ্চিন্তা নিয়ত,
জাগে যার মানসে প্রবল,
সেই ত পাগল।
—দিনে দিনে হ'য়ে পড়ে আপনি পাগল—
জল স্থল তার চোখে সব শূন্যময়!

* * *

ও কি! ও—
উন্মাদ এক কেন আসে ধেয়ে!
রক্ত মুখ—ঘূর্ণিত নয়ন,
বিকট দশন—রুক্ষ কেশ,
ধূলিধূসরিত কায়—
ওহো! কে আছ কোথায়—
ধর—ধর—
শান্ত কর পাগলের খেলা।

* * *

কারাধ্যক্ষ—কারাধ্যক্ষ!
পালাও—পালাও—

এই সব পাগলের সাথে,
তুমিও পাগল হ'য়ে যাবে!
আছে তব প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী,
আছে তব গৃহে ত তনয়—
সুকুমার দুগ্ধপোষ্য নবনী-কোমল?
তবে আর থেকো না এখানে—
পালাও—পালাও—
বাতুলের মেলা হ'তে দূরে সরে যাও!

* * *

আহা! আমার সে শিশু—
কি সুন্দর কেশগুচ্ছ তার,
কিবা গণ্ড—কি চিবুক—কিবা ওষ্ঠাধর—
সকলই সুন্দর!
আমার সে হৃদয়ের আলো!
বাছা মোর আছে ত গো ভাল?
আছে সেত জীবিত ধরায়?
উহুঃ—কি যাতনা—
কেড়ে নিল কে আমার ধন!
ছিঁড়ে গেছে জীবন-বন্ধন!

* * *

আবার—আবার!
কে বলে পাগল নই—আমিই পাগল!
কারাধ্যক্ষ,
আমিই পাগল,
বাঁধ মোরে কঠিন নিগড়ে,
যত চাই ভুলিবারে—তত মনে পড়ে!
(ওহো) এত জ্বালা ভুলিব কেমনে!!

(রোদন)

শ্রী—

প্রজ্ঞা।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ।

১। শরীরের চক্ষু কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা আলোকিত হইলে অসীম জগৎ প্রকাশিত হয়, জগতের শোভা, সৌন্দর্য্য, বিচিত্রতা, সব দৃশ্যমান হয়। চক্ষু বিকৃত, বিনষ্ট বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে সব শূন্য ও অদৃশ্য।

২। আত্মার চক্ষু প্রজ্ঞা। ইহা দ্বারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাজ্য প্রকাশিত হয়, সত্য, রাজ্যের শোভা, সৌন্দর্য্য, বিচিত্রতা দৃশ্যমান হয়। প্রজ্ঞা বিনষ্ট বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে সত্য-জগৎ শূন্য ও অদৃশ্য।

৩। আমরা অনেক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি, অনেক শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে পারি, অনেক বিষয়-রাজ্যের ব্যাপার ও প্রকৃতিরাজ্যের দৃশ্যাবলীর সহিত পরিচিত হইতে পারি, কিন্তু প্রজ্ঞা না থাকিলে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কিছুরই সার গ্রহণ করিতে পারি না, কিছুই জীবনের উপকারে লাগে না। মহাত্মা কাউপার Knowledge ও Wisdom এই দুয়ের কেমন সুন্দর প্রভেদ দেখাইয়াছেন। পুস্তকস্থ বিদ্যা অনেক থাকিলেও তাহা গৃহের জঞ্জাল, জ্ঞান সে সকলকে সুসজ্জিত ও সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া ব্যবহারোপযোগী

করিয়া দেয়। এই Wisdom প্রজ্ঞা নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রজ্ঞা যদি আত্মার চক্ষু হয়, সকলেরই আছে, কেবল বিকাশের ভিন্নতা। প্রাচীন শিক্ষা ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রজ্ঞাকে বিকাশ করে না, বিস্তার বোঝা চাপায়। প্রজ্ঞাতে শক্তি, আনন্দ, সৌন্দর্য্য বিধান করে।

৪। প্রজ্ঞার কার্য্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব। উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচনের সংবাদ যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজ্ঞার আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া অবশ্য পুলকিত ও উপকৃত হইয়াছেন। "আত্মাকে জানিলে সকল লোক প্রাপ্তি হয়, সকল কামনা সিদ্ধ হয়।" এই কথা অসুররাজও শুনিলেন, দেবরাজও শুনিলেন। ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উভয়ে গেলেন। ব্রহ্মা যখন শরীরদর্পণে আত্মদর্শন করিতে বলিলেন, তখন বিরোচন স্থূলবুদ্ধি বশতঃ শরীরকেই আত্মারূপে বুঝিয়া অসুররাজ্যে জড়বাদের প্রচার করিলেন এবং সকলে মৃত্যুর স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন।

কিন্তু দেববুদ্ধি ইন্দ্র প্রজ্ঞাপ্রভাবে শরীর হইতে মন, মন হইতে স্থিরচিত্ত, স্থিরচিত্ত হইতে ক্রমে আত্মার আত্মা অন্তরাত্মাকে জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইলেন এবং দেবরাজ্যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অমৃতের পথ দেখাইলেন।

বরুণ-ভৃগু সংবাদে আছে, যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন, যাঁহাতে জীবিত, প্রলয়কালে যাঁহাতে অবস্থিতি করে, তিনিই ব্রহ্ম। ভৃগু প্রথমে অন্ন, পরে মন, পরে প্রাণ, পরে জ্ঞানকে এই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়া অবশেষে আনন্দময় ব্রহ্মকে সকলের মূলরূপে দর্শন করিলেন।

জাবালি মুনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, যেখানে কেহ দেখিতে পায় না, এমন স্থানে একটা ছাগ বধ করিয়া আইস। কেহ পাহাড়ে, কেহ জঙ্গলে, কেহ নির্জ্জন-ক্ষেত্রে সেই কার্য্য সাধন করিয়া আসিল। কিন্তু এক শিষ্য সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও নির্জ্জন স্থান পাইল না, ঘোর নির্জ্জনেও কাহার চক্ষু সম্মুখে দেখিয়া ভীত হইয়া গুরুর নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল। গুরু তাহাকেই বিদ্বান্ ও প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"যাহাদের চক্ষু আছে, তাহারা দেখুক, যাহাদের কর্ণ আছে তাহারা শুনুক" যিশু উপদেশ দিবার সময় এই কথা বারম্বার বলিয়াছেন। চক্ষু কর্ণ ত সকল মানবেরই আছে, কিন্তু সকলে কি দেখে, সকলে কি শুনে? প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিরাই দেখিতে ও শুনিতে পায়।

এই প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়—তাই সব সাধুজনের এক কথা। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য ঋষি হিমালয়কন্দরে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রজ্ঞা চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐক মার্কিন জ্ঞানী হ্রদের তটে বসিয়া তাহাই দেখিতেছেন, তাহাই ভাবিতেছেন। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি আছে?

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাতে ভারতীয় রাজস্ব ও কারেন্সি কমিশনের সমক্ষে বে-সরকারী সাক্ষ্য—বিলাতের ভারতীয় রাজস্ব ও কারেন্সি কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনারেবল্ রাজা হৃষীকেশ লাহা, সি, আই ই, অনারেবল্ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, অনারেবল্ ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মিঃ জে, সি, সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ প্রভৃতির সাক্ষ্য দিবার ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে।

বৌদ্ধ স্মৃতি—মহাভারতে বর্ণিত নরপতি শিবি আশ্রিত কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য আপনার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের এই স্মৃতি-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়া লণ্ডনের যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের কীর্ত্তি ভারতে থাকিলেই ভাল হইত।

শিশু-প্রদর্শনী—সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্ক নগরে এক শিশু-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। এক শত মাতা আপন আপন শিশুদিগকে লইয়া সেই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহু সহস্র মাতা সেই শিশুদিগকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ডাক্তার ডেন্টে শিশুদিগের মুখের ভাব, বক্ষঃস্থল, মেরুদণ্ড, হস্ত, পদ, জ্ঞান, উচ্চতা, তেজস্বিতা ও স্বভাব প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া নম্বর দিয়াছিলেন। যে সকল শিশু অধিক নম্বর পাইয়াছিল, তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

এক বৎসর একটী শিশু পুরস্কারের অযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার মাতা বৎসর কাল তাহাকে এরূপ পুষ্টিকর সামগ্রী খাওয়াইয়াছিলেন ও তাহার আরামের এরূপ আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন যে, পর বৎসর সেই শিশু প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

ইউরোপের জননীগণ সন্তানগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য কত চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করেন, আমাদের পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বোম্বায়ে বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রদানের চেষ্টা—বোম্বাইয়ের কতিপয় ধনশালী ব্যক্তি বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রদানের জন্য এক কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। নগরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে প্রতি বৎসর কত শিশু প্রাণ হারাইতেছে। কত দরিদ্র অর্থের অভাবে শিশুদিগের দুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে পারে না। এই কোম্পানী এইরূপ দরিদ্রদিগকে অবস্থা নির্ব্বিশেষে

অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে দুগ্ধ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাঁদের এই সাধু চেষ্টা সফল হউক ও সর্ব্বত্র ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

হাঁসপাতালে পাঠাগার—কলিকাতার মেডিকেল কলেজে শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় রোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে। শ্বেতাঙ্গ রোগীদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত এখানে একটি পাঠাগার আছে, কিন্তু দেশীয় রোগীদিগের জন্য এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণের উদ্যোগে এখানে দেশীয় রোগিগণের নিমিত্ত একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শোকসংবাদ—আমরা ব্যথিতহৃদয়ে পুনরায় ভারতের কয়েক জন সুযোগ্য সন্তানের চির-বিয়োগসংবাদ প্রদান করিতেছি। ভারতীর সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী ও কংগ্রেসের জনৈক উৎসাহী সভ্য, মিঃ জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় গত ১৯শে বৈশাখ, রাত্রি নয় ঘটিকার সময়, দুই কন্যা এবং এক পুত্র ও বৃদ্ধা পত্নীকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা। মহর্ষি ইহাঁর মধুর স্বভাবের জন্য ইহাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভগবান্ এই শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন।

প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা অভিধানকার ও বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিগত ২৭শে এপ্রিল অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হৃদ্‌রোগেই ইহাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

১৩ অধ্যায়।

মাসিডন দেশের সহিত ও আণ্টিওকসের সহিত রোমের যুদ্ধ

১। ৫৫০ রোমাব্দে কার্থেজের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে মাসিডনের সহিত রোমের সংগ্রাম হয়।

২। হানিবল যখন ইটালী জয় করেন, তখন মাসিডনাধিপতি ফিলিপ তাঁহার আনুকূল্য করাতে এই যুদ্ধ ঘটে।

৩। সাইনোসিকেলির রণক্ষেত্রে খৃঃ পূঃ ১৯৬ অব্দে রোমানেরা জয়ী হইল। পরে ফিলিপ সন্ধির প্রার্থনা করাতে রোমানেরা তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বলিল, গ্রীসের কোনও দেশ তাঁহার অধীন থাকিবে না।

৪। এই যুদ্ধের অনতিবিলম্বে ৫৬২ রোমাব্দে সিরিয়াধিপতি মহাবীর আণ্টিওকসের সহিত রোমের যুদ্ধ হয়।

হানিবল ঐ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে সমরোৎসাহিত করিবার তিনিই প্রধান কারণ।

৫। আন্টিওকস, রোমীয় সেনাপতি লুসস সিপিওর নিকটে পরাভূত হয়েন এবং পরিশেষে যেরূপ সন্ধি-বন্ধনে বদ্ধ হয়েন, তাহাও তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অবমানকর হইয়াছিল।

৬। মাসিডনের সহিত রোমের সন্ধি ২০ বৎসর ছিল। পরে মাসিডনাধিপতি ফিলিপ যুদ্ধের পুনরুদ্যোগ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র পার্সিয়স্ খৃঃ পূঃ ১৭১ অব্দে রোমানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই শেষ রাজা পিডনার ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এমিলিয়স কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ইহাতে ৩০ হাজার মাসিডনের সৈন্য বিনাশ পায়। রোমানেরা অগাধ ধন লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং মাসিডন রাজ্য এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

১৪ অধ্যায়।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

১। খৃঃ পূঃ ১৪৫ অব্দে ও ৬০৭ রোমাব্দে কার্থেজের সহিত আবার রোমের যুদ্ধ হয়। ইহারই নাম তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

২। কার্থেজিনিয়ানেরা সন্ধির প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়া রোমের মিত্র নিউমিডিয়াধিপতি মেসেনেসার সহিত বিবাদ করিয়াছিল, ইহাতেই যুদ্ধ ঘটে। এই সংগ্রাম চারি বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। পরে পরসিয়স্ কর্ণেলিয়স সিপিও কার্থেজ নগর অধিকার করিয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

৩। কার্থেজিনিয়ানদিগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্বদেশরক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে কোন মতে রক্ষার উপায় না দেখিয়া মাতৃভূমির চিতানলে আপনারাও প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে কার্থেজের সমুদায় ক্ষমতার নির্ব্বাণ হইলেই পিউনিক যুদ্ধের শেষ হইল। (ক)

(ক) কার্থেজ, এক শত বৎসর পর্য্যন্ত রোমের ভয়ঙ্কর প্রতিযোগী হইয়াছিল এবং ৭০৮ বৎসর অবস্থিতি করিবার পর ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনাটি ৬০৮ রোমাব্দে, কন্সল দ্বারা রাজ্যশাসনের ৩৬৩ বৎসর পরে ও খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

কার্থেজ নগরে বহুলোক বাস করিত। ইহার পরিধি ২৪ মাইল ছিল। অনেক জাতির সহিত ইহার বাণিজ্য ব্যবসায় চলিত এবং ইহা সুশোভন বৃহৎ অট্টালিকাসমূহে সুশোভিত ছিল।

কার্থেজ ১৭ দিবস অগ্নিময় ছিল। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, রোম-সেনাপতি সিপিও ইহার ধ্বংসাবলোকনে চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ে কিছুমাত্র শোক বা করুণ ভাবের উদ্রেক হয় নাই। কারণ রোমীয় মহাসভা ইহার উচ্ছেদ সংবাদ পাইয়া হর্ষোন্মত্ত হইয়া মহাড়ম্বরে রাজ্য-মধ্যে ধুমধাম ও কেলি কোলাহল করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা আরও প্রচার করিলেন যে, কার্থেজ কখনও পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইতে পারিবে না এবং যে ব্যক্তি সেরূপ ইচ্ছা করিবে, সে সকলের নিকট ঘৃণার্হ ও দণ্ডার্হ হইবে। কার্থেজ বর্ত্তমান টিউনিস্ নগরের নিকটে ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষোপরি সেল্‌কা নামে এক ক্ষুদ্রদ্বীপ বিদ্যমান আছে।

১৫ অধ্যায়।

করিন্থ ও পর্টুগালের যুদ্ধ।

১। করিন্থনগরে রোমের এক দূত বাস করিত। ঐ নগরের লোকেরা তাহার প্রতি কুব্যবহার করাতে রোমানদিগের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হয়।

২। এই যুদ্ধে রোমকেরাই জয় লাভ করিয়াছিলেন। করিন্থিয়ানদিগের অধিকাংশ লোক হত হইল এবং তাহাদিগের রাজধানী ভস্মসাৎ হইল।

স্পেনে রোমানদিগের যুদ্ধ (খৃঃ পূঃ ২০০-১৩৩) ৬০ বৎসরের অধিক চলিয়াছিল। পর্টুগালদেশীয় ভেরিএথস নামক এক ব্যক্তিকে এই যুদ্ধে আপনাদিগের সেনাপতি করিয়া স্পেনবাসীরা অতুল সাহসের সহিত রোমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু রোমানেরা সম্মুখ যুদ্ধে উক্ত বীরপুরুষকে কোন ক্রমে পরাস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে যখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার তিন জন বন্ধুকে উৎকোচ দিয়া তাঁহার বধ সাধন করিল। ইহাতে ৬০৮ রোমাব্দে পর্টুগাল দেশ রোমের অধীন হইল। ইহার পরেই স্পেনে নিউমানসিয়ার সহিত যুদ্ধ হয়।

১৬ অধ্যায়।

স্পেনদেশস্থ নিউমানসিয়ার ধ্বংস।

১। কার্থেজ বিনাশিত হইবার ষোড়শ বৎসর পরে নিউমানসিয়া উচ্ছেদদশায় পতিত হয়।

২। কার্থেজ-বিনাশক সিপিও এ যুদ্ধেও প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

৩। এই সংগ্রাম চারি বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, পরে তথাকার লোকেরা নগর-পরিখার মধ্যে কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া যখন স্বাধীনতা লাভে একান্ত নিরাশ হইল, তখন আপনারাই আপনাদিগের প্রাণনাশ করিল।

৪। রোমকেরা নিউমানসিয়া উৎখাত করিয়া ফেলিল এবং স্পেনদেশ (খৃঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে) রোমের এক প্রদেশ হইল।

অর্থের সহচর।

(১)

রহে যতক্ষণ মধু ফুল্ল পুষ্পদলে,
অলি করে গুণগান, করে কত মধু পান,
কুসুমে গুঞ্জরি উড়ে কত কুতূহলে,
রহে যতক্ষণ মধু ফুল্ল পুষ্পদলে।

(২)

নিঃশেষিত হ'লে মধু, উড়ি' চ'লে যায়,
অন্বেষে নব প্রসূন, থেমে যায় গুণগুণ,
আবার আসিয়া বসে অন্য ফুলগায়,
নিঃশেষিত হ'লে মধু, উড়ি' চ'লে যায়।

(৩)

তেমতি ধনীর কাছে ধনের আশায়
ছুটে আসে কত জন, সখা, মিত্র,
বন্ধুগণ,

তোষামদ করে সবে, কত গুণ গায়,
তেমতি ধনীর কাছে ধনের আশায়।
(৪)
হয় ধনী পুনরায় যবে অর্থহীন,
ত্যজিয়া বিপদ পরে, পলায় অন্যের দ্বারে,
উপেক্ষা করয়ে সবে ব'লে তা'রে দীন,
হয় ধনী পুনরায় যবে অর্থহীন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন সংবাদ।

১। সিমলা শৈলে পথের ধূলা বিনষ্ট করিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপালিটি ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তৈল ক্রয় করিয়া পথে ঢালিয়া দিবেন, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

২। কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচারার্থ সাহিত্য পরিষদের হস্তে বার্ষিক দেড় শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৩। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ধলভূম নামক স্থানের কোন কোন স্থলে স্বর্ণ-রেণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যাইতে পারে।

৪। শুনা যাইতেছে, সম্প্রতি কানাডা দেশের অটোয়া নগরে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশ বিভাগে দুই জন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা রেলযাত্রী স্ত্রীলোকদিগের সহায়তা করিবেন ও অসহায়া বালিকাদিগকে রক্ষা করিবেন।

৫। বোম্বাই নগরে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

৬। বড় লাট লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ৪০০০৲ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

৭। আগামী ১৯১৬ সালের প্রারম্ভে কলিকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট প্রদর্শনী হইবে। প্রায় ৩॥০ শত বিঘা জমির উপর ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

৮। বিগত ২রা মে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে পরলোকগত ডাক্তার চুকুড়ি ঘোষ মহাশয়ের ও তাঁহার পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ঘোষ ২রা এপ্রেল ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী যখন শুনিলেন স্বামীর জীবনের আর আশা নাই, তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেই সাধ্বী পত্নীর আত্মা স্বামীর সহিত অনন্ত ধামে অনন্ত মিলনে মিলিত হয়। ইহাকেই যথার্থ সহমরণ বলা যায়। ইহাই প্রকৃত প্রাণের যোগ।

৯। বার্লিন নগরের ডাক্তার মর্বার-ম্যান চির-যৌবন লাভের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি বলেন, রেডিয়াম নামক বহুমূল্য ধাতু মনুষ্যের ধমনীতে সঞ্জীবতা আনয়ন করে, সুতরাং মানুষ ইচ্ছা করিলেই অতি সহজে চির-যৌবন লাভ করিতে পারে।

১০। ফরাসী দেশে মৎস্য ধরিবার জন্য একরূপ টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৎস্যগণ জলে বিচরণ করিবার সময় একরূপ শব্দ হয়। ঐ শব্দ জল-মধ্যে রক্ষিত তার দ্বারা তীরে রক্ষিত কলে প্রতিধ্বনিত হইলে তারে যে একটা বোতাম সংযুক্ত থাকে, সেইটি টিপিয়া দেওয়া হইলেই বিস্ফোরক দ্রব্য বিস্ফুরিত হইয়া মৎস্যকে বিনষ্ট করে।

১১। মিঃ বিহারী লাল গুপ্ত মহাশয় বরোদা রাজ্যের অস্থায়ী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম সম্প্রতি তিনি এই পদে স্থায়ি-রূপে,নিযুক্ত হইয়াছেন।

১২। সম্প্রতি বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট জেমস্ বোর্ডিলনের মৃত্যু হইয়াছে। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট-গণ একে একে কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছেন। এই সে দিন বেকার সাহেব গিয়াছেন, আবার বোর্ডিলনও যাইলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

১৩। সম্প্রতি আমেরিকার হাউয়ার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রেট ফিজ মিসর দেশের পিরামিডের অভ্যন্তরে দুইটী মন্দিরের আবিষ্কার করিয়াছেন।

কলিকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়ে লর্ড কার-মাইকেল মহোদয় আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

সমালোচনা।

স্নেহময়।—

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ প্রণীত।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস, মূল্য ।৵০।

গল্পটী অতি সুন্দর, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। কলুষিত-চরিত্র পঙ্কিল নারীজীবন দ্বারা সোনার সংসার কিরূপে ছারখার হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত অতি সুন্দর-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে তাহার ফল কিরূপ বিষময় হয় ইহা পাঠে সে জ্ঞান জন্মিবে। আমরা প্রত্যেক গৃহিণীকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি, ইহা পাঠে তাঁহাদের প্রভূত কল্যাণ হইবে। লেখিকার লিখিবার শক্তি আছে। এই পুস্তকখানি বোধ হয় তাঁহার প্রথম রচনা, এজন্য স্থানে স্থানে দুএকটি দোষ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, ইনি পরে একজন সুলেখিকা হইবেন।

সদ্ভাব কুসুম।—

ইহা অমর কবি ৺রজনীকান্ত সেন প্রণিত. মূল্য।• আনা।

এইখানি ছোট শিশুদিগের উপযোগী সরল নীতি ও উপদেশপূর্ণ কবিতা পুস্তক। মৃত কবির পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। দেশবাসী সকলেই কবি রজনীকান্তকে চিনেন। তাঁহার 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অভয়া' যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরিত্রের মধুরতার আস্বাদন পাইয়াছেন। ইঁহার রচিত পুস্তকের আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কবির চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। প্রত্যেক জনক জননী তাঁহাদের সরলমতি শিশুদিগের হস্তে এই পুস্তক দিয়া তাহাদের কোমল হৃদয়-বৃত্তির স্ফুর্ত্তি সাধন করুন। এস, কে, লাহিড়ী মহাশয় স্বর্গীয় কবির নিরাশ্রয় পরিবারের জন্য নিজ ব্যয়ে ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। স্কুলের পাঠ্যরূপে এই পুস্তকখানি গৃহীত হইলে আমরা যারপরনাই সুখী হইব। আশা করি শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কবির পরিবারবর্গের প্রতি কৃপা করিয়া ও কবির সম্মান রক্ষা করিয়া দেশবাসী সকলকে সুখী করিবেন।

বামারচনা।

চাহি না।

সংসার! আমারে আর দেখা'ও না ভয়,
ভাল নাহি বাস যদি দিও না আশ্রয়।
অমর-আশ্রিত যবে হবে ক্ষুদ্র হিয়া
বিভুর কৃপায় যাব তোমারে ত্যজিয়া।
ভীষণ মূরতি হেরে প্রকম্পিত কায়,
কত কাল বিভীষিকা দেখাবে আমায়।
তোমার করাল মূর্ত্তি দেখে লাগে ভয়,
তোমা হতে স্বার্থসিদ্ধি কাহার কি হয়?
তোমার পিচ্ছিল পথে পাব কি তাঁহারে
তন্ন তন্ন খুঁজি যাঁরে জগত মাঝারে।
মায়ার ভিতরে তিনি না রহেন কভু,
তিনি যে আমার সেই প্রাণারাম বিভু।

শ্রীমতী ইন্দুমতি দেবী।

নব বর্ষ।

১

নব বরষের নাথ! মধুর উষায়,
কেমন প্রফুল্ল বিশ্ব তোমার কৃপায়।
কুসুমসৌরভ লয়ে
অনিল যেতেছে ব'য়ে
গাইছে আনন্দে পাখী বিটপি-শাখায়।

নবীনে মধুরে আজি মিশেছে ধরায়।

২

নব বরষের এই মধুর উষায়,
তোমার পবিত্র নামে ধরা পূর্ণ হায়!
তটিনী লহরী তুলে,
নেচে যায় হেলে দুলে
আনন্দে মাতিয়া সবে নমিছে তোমায়,
গুণ গুণ রবে অলি তব নাম গায়।

৩

নব বরষের এই মধুর উষায়,
আমিও প্রণমি নাথ! ও রাতুল পায়।
শুধু নিজ স্বার্থ লয়ে,
সারা বর্ষ গেছে ব'য়ে,
হে বিশ্ব আরাধ্য দেব! ডাকিনি তোমায়।
কে জানে কি ঘুম ঘোরে রাখিলে আমায়!

৪

নব বরষের এই মধুর উষায়,
হে বরেণ্য! এই ভীক্ষা মাগি তব পায়।
যে দিকে ফিরাব আঁখি,
যেন গো তোমারে দেখি,
তব নামে, তব প্রেমে, তোমারি কথায়,
করিয়া তোমারি কার্য্য বর্ষ যেন যায়।

৫

নব বরষের এই মধুর উষায়,
মাগি এই ভীক্ষা নাথ! দাও গো আমায়!
হে দয়াল বিশ্বপতি! ওহে অগতির গতি!
বারেকের তরে যেন না ভুলি তোমায়।
এই শুভ দিনে দাসী এই ভীক্ষা চায়।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র। (হুগলী)

পিপাসিত।

লক্ষ্য-হারা, পথ-হারা, দিশা-হারা আমি,
পশু হইতেও হীন জীবন আমার,
নিশি দিন ডুবে রহি মোহ-পঙ্কে হায়!
দেখাইয়ে দাও মোরে মুক্তির দুয়ার।

২

কত কাল রব আর মায়া মোহে মজি
দারুণ পিয়াসা লয়ে চাতক যেমন,
ধরণীর সুখ হায় মরীচিকা সম,
জলে তাই তৃষানলে হৃদয়-গহন।

৩

"আমার" বলিতে ভবে যা কিছু বুঝায়
তুমি ছাড়া কিছু নাই দাও বুঝাইয়ে,
বসুধার প্রলোভনে আশার কুহকে
রেখোনা রেখোনা আর মিছে ভুলাইয়ে।

৪

দাও হে সন্তান দেব! অনন্ত সুখের
না হয় গাহিতে যাহে নিরাশার গান,
ঢাল তব সুধা-ধারা মরু-দগ্ধ প্রাণে
নিদারুণ তৃষা মোর হোক্ অবসান।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত, চট্টগ্রাম।

মর্ম্মকথা।

শৈশব-জীবনে মোহের স্বপনে
  নিয়ত আছিনু ভোর।
সহসা গো তুমি দেবতা! আমার
  ভাঙ্গালে স্বপন ঘোর।
তুমিই বাজালে প্রেমের বাঁশরী,
ধ্বনিয়ে নিভৃত হৃদয় আমরি!
জাগালে কতই বাসনা লহরী,
  আমার সুষুপ্ত মরম-তলে।
তুমি এ হৃদয়ে প্রণয়ের ছবি
আঁকিয়া দিয়াছ মধুময় সবি,
আলো দেয় হৃদে তব প্রীতি রবি,
  তোমারি প্রেমের মোহন বলে।
তোমারি মধুর প্রণয় পরশে,
হৃদি-কুঞ্জে ফুটে ফুল সে হরষে,
মলয় মারুত সুখ সে বরষে,
  আনন্দে বিহগ ধরেছে তান।
তব অপরূপ রূপের তরঙ্গে,
  ঢালিয়া দিয়াছি এ ক্ষুদ্র প্রাণ।
আমি তব প্রেমে আছি নিমগন,
  আমার আমিত্ব ভুলে।
আমার বলিতে যা কিছু তা সব—
  দিয়েছি ও পদে তুলে।
তোমাতে মিশিয়া তোমাতে মজিয়া,
তোমার মূরতি হৃদয়ে আঁকিয়া,
পূজি দিবানিশি পরাণ ভরিয়া,
  প্রেম-পুষ্প তুলি হৃদয় হ'তে।
তব ইষ্ট নাম জপি সদা আমি
  বিভোর বিহ্বল বিমুগ্ধ চিতে।
যেন তুমি মম জীবনে মরণে,
  হ'ও দেব! মোর স্বামী।
জনম জনম মুগধ রহিব,
  তোমাময় হ'য়ে আমি।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

এস!!

১

আধ আলো, আধেক আঁধারে,
অনাবিল নির্জ্জনমাঝে,
কত বার দেখেছি তোমারে,
প্রকৃতির শ্যাম-স্নিগ্ধ সাঁঝে॥

২

আজ কার হৃদয়-গগনে
উদেছিল পূর্ণ শশধর,
এ হৃদয় বিজন-কাননে,
ফু'টেছিল পুষ্প মনোহর॥

৩

গেয়েছিল বিহগ সুস্বরে,
ব'য়েছিল মৃদু সমীরণ,
শুধু হায়! ক্ষণেকের তরে,
ভাবি বিশ্ব নন্দন কানন॥

৪

মরি মরি নিমেষের তরে,
দেখেছিনু কি পরিবর্ত্তন,
শুষ্ক-মরু পাষাণ অন্তরে,
বসন্তের নব উপবন ॥

৫

রঙ্গভূমে যবনিকা প্রায়
উজলিয়া হৃদয় আমার,
দৃশ্য পট মুহূর্ত্তে লুকায়,
এবে সব দেখি অন্ধকার ॥

৬

দিবসের শেষ আলো জ্যোতিঃ,
নিভে যথা গোধূলির কোলে,
সুকুমার বালক যেমতি,
জেগে উঠি স্বপ্ন কথা ভোলে ॥

৭

তেমতি স্মৃতির ক্ষীণ রেখা,
ক্রমে আসে ক্ষীণতর হ'য়ে,
আর যদি নাহি দিবে দেখা,
বল তবে থাকিব কি ল'য়ে?

৮

এ হৃদয়ে কিছু নাহি আর,
সকলি সঁপেছি সেই ক্ষণে,
তুমি মম জীবনের সার,
সব শূন্য তোমার বিহনে ॥

৯

হৃদয়ের আকুল আহ্বান,
পশে না কি অন্তরে তোমার?
মম সুখ শান্তির নিদান
এস তুমি এস একবার ॥

১০

শান্ত, সৌম্য, মধুর কিরণে,
উজলিবে হৃদয় আমার,
পূর্ণ শশী হেরিয়া গগনে,
দূরে যাবে যত অন্ধকার ॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ,
বারুইপাড়া খুলনা।

১৩।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।